প্রতিদিন ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

# রবিবার

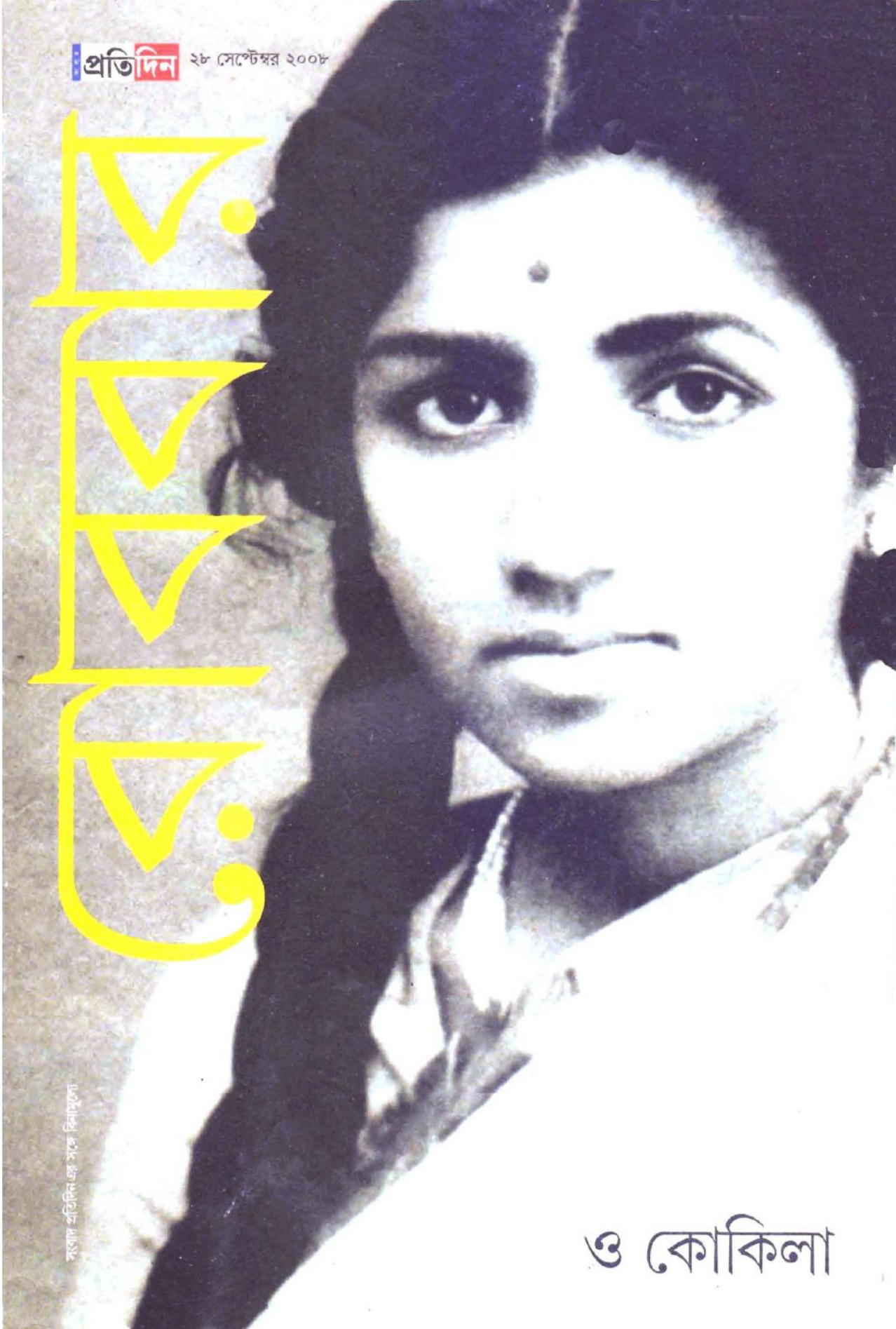

## ও কোকিলা

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে

# ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in


## আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরোনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অন্টিমাস প্রাইম ও পি. ব্যান্ডস কে - যারা আমাকে এডিট করা দারুণ ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি হাতে নেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

**There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance**

**SUBHAJIT KUNDU**

www.anjali.bz

# পাগল করা পুজো সেল

এবার পুজোয়
অঞ্জলি জুয়েলার্স
দিচ্ছে গয়নার মজুরীতে
৫০% পর্যন্ত ছাড় !
গ্রহরত্নের উপর রয়েছে
১০% ছাড় !

সাপ্তাহিক
বাম্পার ড্র-তে জিতুন
২২টি রেফ্রিজারেটর,
২২টি মোবাইল,
২২টি মাইক্রোওয়েভ ওভেন,
২২টি স্টিম কুকার

জিতে নিন
গিফ্‌ট্ ভাউচার,
প্রতি ঘন্টায় লাকি ড্র।

অঞ্জলি
জুয়েলার্স®
সবার জন্য

Mayurakshi/091/08

শুধুমাত্র ৪ঠা সেপ্টেম্বর থেকে দুর্গাসপ্তমী ২০০৮ পর্যন্ত।

গোলপার্ক - ২৮এ গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা ২৯, ফোন - ২৪৪০ ১৭৯২/২৪৬০ ০৫৮১
শোভাবাজার - ৩৮ অরবিন্দ সরণী, শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের পাশে, কলকাতা ৫, ফোন - ২৫৩৩ ৫৮৩২/৩৪
সল্টলেক - বি ই ১০১, কোয়ালিটি মোড়, কলকাতা ৬৪, ফোন - ২৩২১ ২০৫৭/২৭৮৬
সল্টলেক - এইচ. এ ৩, জিডি আইল্যান্ডের পাশে, কলকাতা ৯৭, ফোন - ২৩২১ ৮৩১০/১১
বেহালা - ৫২২ সি ডায়মন্ডহারবার রোড, স্টেট ব্যাঙ্কের পাশে, কলকাতা ৩৪, ফোন - ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫
হাওড়া - ১০৫ দেশপ্রাণ শাসমল রোড, পঞ্চাননতলা, হাওড়া ৭১১ ১০১, ফোন - ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১
এছাড়া আমাদের আর কোনো শাখা নেই।

সব দোকান সপ্তাহে সোম থেকে শুক্র সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত
শনি ও রবি সকাল ১০.৩০ থেকে রাত ৯.০০ পর্যন্ত খোলা থাকবে।

*শর্তাবলী প্রযোজ্য

রোববার

২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮

সংবাদ প্রতিদিন-এর সঙ্গে বিনামূল্যে


লেটারবক্স
পাঠকের পাতা ৪

ফার্স্ট পার্সন
ঋতুপর্ণ ঘোষ ৬

ভালো-বাসার বারান্দা
নবনীতা দেবসেন ৮

এবার মলাট
ও কোকিলা
অতনু চক্রবর্তী ১২

বাংলার মুখ
পথের পাঁচালি
জয়া মিত্র ২৬

রোববারের রামপ্রসাদী
আয় মন বেড়াতে যাবি
সুব্রত মুখোপাধ্যায় ২৮

রোববারের মেগা
ঝিলডাঙার কন্যা
প্রচেত গুপ্ত ৩২

সেন সলিউশনস
রাইমা সেন ৩৯

রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ
স্টারস্ট্রাক-এর
ফিশ অ্যান্ড চিপস্ ৪০


টিম রোববার

তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
নীলাঞ্জনা বসু
প্রসূন চক্রবর্তী
বর্ণিনী মৈত্র চক্রবর্তী
বিপুল গুহ
ভাস্কর লেট
রিংকা চক্রবর্তী
রাজু সরদার
শান্তনু দে
সন্তোষ দত্ত
সুপ্রিয় দাস


সম্পাদক ঋতুপর্ণ ঘোষ
সহযোগী সম্পাদক অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়

প্রতিদিন প্রকাশনী লিমিটেডের পক্ষে সৃঞ্জয় বোস কর্তৃক
বি এল পাব্লিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত।

# আমদরবার

ফলের রাজা আমের নাম শুনলেই সকলের মন আনন্দে নেচে ওঠে। গ্রীষ্মে আম যেন শীতের এক টুকরো রোদ্দুর। ফলের সাম্রাজ্যে আমের নিরঙ্কুশ একাধিপত্য সর্বজনবিদিত। তার মোহময়ী সান্নিধ্য গরমের যত গ্লানি সব ধুয়ে-মুছে দেয়। অতএব আমের প্রতি যে আমজনতার প্রগাঢ় দুর্বলতা থাকবে, তা জানা কথা। রোববার-এর 'আমতত্ত্ব' সংখ্যায় তারই প্রতিধ্বনি শুনতে পেলাম। প্রকারভেদে সারা দেশে আমের যে বৈচিত্রপূর্ণ উপস্থিতি তা সত্যিই বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় নানা ভাষায় আমের ভিন্ন ভিন্ন নাম রয়েছে। সংস্কৃতে কামসর, গুজরাটিতে অমরি, মারাঠিতে আম্বা প্রভৃতি। অতীতে বিখ্যাত ব্যক্তিরাও আমের প্রেমে হাবুডুবু খেতে বাধ্য হয়েছেন। এই আমপ্রীতির পরম্পরায় বিশ্বকবিও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তো তিনি লিখে গিয়েছেন, 'আমসত্ত্ব দুধে ফেলি তাহাতে কদলি দলি...'।

দেবাশিস হাজরা হাওড়া

## প্রাণজুড়ানো লেখা

মন্দার মুখোপাধ্যায়ের 'আমপাতা জোড়া জোড়া' লেখাটি তুলনাহীন। আমার ধারণা লেখাটি আমার মতো আরও অনেক সাধারণ বাঙালির হৃদয় স্পর্শ করেছে। অনেকদিন পর এমন সুন্দর প্রাণজুড়ানো লেখা পড়ে কিশোর বয়সের নানা স্মৃতি মনের আকাশে ভেসে উঠল।

আগেকারদিনে নবাব, বাদশা অথবা জমিদারেরা তাঁদের বিত্তের অহংকার প্রকাশ করতে ভারতের বিভিন্নপ্রান্ত থেকে আমের কলম এনে তাঁদের বিশাল আমবাগানে লাগিয়ে আমের নামকরণ করতেন। দশজনকে ডেকে, দেখিয়ে, খাইয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। সাধারণ মানুষ সে আম থেকে বঞ্চিত থাকত। সাধারণ গরিব মানুষ গাছতলায় পড়ে থাকা আম কুড়িয়ে, খেয়েই আনন্দ পেত।

আম আর আমগাছের সঙ্গে বাংলার মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক, সেটি খুব সুন্দর আবেগপূর্ণ ভাষায় লেখিকা প্রকাশ করেছেন। দীর্ঘদিন পরে মনের মণিকোঠায় হাত বাড়াতে সাহায্য করলেন লেখিকা।

লেখার মাধুর্যে 'আমপাতা জোড়া জোড়া' আমবাঙালির হৃদয় মথিত করেছে। বাংলার ঘরে ঘরে ব্রতকথা থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, কতভাবে আম ও আমগাছের প্রয়োজন—সেদিকটা লেখিকা সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন।

এখনকার ছেলেমেয়েরা ছুটছে কেবল নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে। বারো মাসে তেরো পার্বণের খবর তাদের কাছে মূল্যহীন। লেখাটি তারা যদি যত্ন করে পড়ে তাহলে উপকৃত হবে। মনমাতানো, প্রাণজুড়ানো 'আমপাতা জোড়া জোড়া'র জন্য মন্দার মুখোপাধ্যায়কে অনেক ধন্যবাদ।

প্রশান্ত রায় উত্তর চব্বিশ পরগনা

## ফলের রাজা

'আমতত্ত্ব' সংখ্যাটিতে আম ও বাঙালির এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইতিবৃত্তের প্রকাশ ঘটেছে। ভাবতে অবাক লাগে, সর্বঘটে আম না বলে কাঁঠালি কলা কেন বলি! আমের কৃতিত্ব হল, সে একইসঙ্গে মন ও রসনাকে পরিতৃপ্ত করে। আমজনতার আম একাধারে যেমন সকল শুভ মুহূর্তের সাক্ষী তেমনই আবার উদরপূর্তির শ্রেষ্ঠ ফলাহার। তাই তো বাঙালি তাকে ফলের রাজা বলে চিহ্নিত করে। দুঃখ লাগে, বেশিরভাগ বাঙালিই এখন রক্ত সুগারে আক্রান্ত। স্বভাবতই ডাক্তারবাবুরা আম ভক্ষণে দাঁড়ি টেনে দিয়েছেন তবু যেন আমরা আমকে জীবন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। বাদশা, সম্রাটরা তো আমদরবার বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই আমকে অন্দরমহলে সাদরে গ্রহণ করেছেন তবু 'আমতত্ত্ব' সংখ্যায় যেন রয়ে গেল কারণ বিভিন্ন সময়ের আমের তালিকা খুঁজে পেলাম না। তবুও বলব, 'আমতত্ত্ব' জিন্দাবাদ, বারবার ফিরে আসুক

পল্টু ভট্টাচার্য হাওড়া

## আমপরিচিতি

'আমসংকীর্তন' একটি উপাদেয় প্রতিবেদন। আমের আন্তর্জাতিক খ্যাতি বিস্ময়কর। সরস লেখনী, গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মিশ্রণে আমের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি তুলে ধরেছে এই লেখা তথা তত্ত্ব। আমের এমন আমপরিচিতি এর আগে পাইনি। আম বিভিন্ন মানুষের বন্ধনের সেতু, সুস্বাদু সম্পর্কের উৎস। রোববার-এর উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

হীরালাল শীল আসানসোল

## হারানো শৈশব

প্রতিটি পাঠকের রসনা চরিতার্থ করতে রোববার উপহার দিল 'আমতত্ত্ব'। বিনামূল্যে কমপ্ল্যান পেলেও বিনামূল্যে আম-প্ল্যান কিন্তু ফাটাফাটি।

আম কাঁঠালের সুগন্ধ দিয়ে শুরু করে 'ফার্স্ট পার্সন' লিখেছেন, 'দিন আসছে। দিন যাচ্ছে। একঘেয়েমির ছন্দ নিয়ে। আম কাঁঠালের গন্ধ নিয়ে।' সত্যিই এই গন্ধ যেন পাতায় পাতায়, ছত্রে ছত্রে। এমনকী অন্তিম দু'পাতাতেও আম আর শোল দিয়ে তৈরি হয়েছে 'আম-লা-শোল'।

নবনীতাদির 'দেওয়ান-ই-আম', মন্দার মুখোপাধ্যায়ের 'আমপাতা জোড়া জোড়া', অমিতাভ চৌধুরীর 'আমসংকীর্তন', জয় গোস্বামীর 'গোসাঁইবাগান' কোনটা ছেড়ে

কোনটায় যাই।

রোববার-এর 'আমতত্ত্ব' এক মুহূর্তে আমাদের শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। ঝড়ের ক্ষিপ্রতায় আম কুড়ানোর সে মজা ভুলবার নয়। শুধু কি নিজের গাছের? ঝড়ে পড়ে যাওয়া আমের কোনও সত্তাধিকার নেই, মালিকানা নেই, আছে অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার। সেই অধিকার কায়েম করেই দিনেদুপুরেও ডাকাতি করতাম। 'আমতত্ত্ব' আরও একবার উসকে দিল হারানো শৈশবের স্মৃতিকে।

সোফিয়ার রহমান উত্তর চব্বিশ পরগনা

## জানা-অজানা কথা

৪ মে'র 'ফার্স্ট পার্সন' যেন একটি নিটোল কবিতা। এবার মলাটের 'আমতত্ত্ব' এবং 'ভালো-বাসার বারান্দা'য় আম নিয়ে মোট তিনটি লেখা পড়ে অভিভূত হলাম। কত না জানা কথা জানলাম এবং অনেক জানা কথা আবার জেনে, ভাল লাগল।

নবনীতা দেবসেন মুর্শিদাবাদ নবাব বাড়ির আমের বিবরণ

দিয়েছেন। ভাল লাগল পড়ে। বিশেষ করে ভাল লাগল বিমলি আম আর ধোপানী সিঁদুরে আমের কথা জেনে। ফল বেশি মজে গেলে খেতে ভাল লাগে না। আম তো বটেই। তাই দিন হিসেব করে খেতে হয়।

মন্দার মুখোপাধ্যায় আমাকে নিয়ে গিয়েছেন আমার বালক বয়সে। প্রাকস্বাধীনতাকালে ঝিনুক শানে ঘষে ফুটো করে কচি আম চুলে খেতাম। দেশভাগের পর এ বঙ্গে এসে তেমন করে কাউকে আম চুলে খেতে দেখিনি। মন্দার আম খাওয়ার নানা প্রকার ও প্রকরণের কথা লিখেছেন, যা খুবই উপাদেয় এবং যার অধিকাংশই আমার পরিচিত বলে আমাকে স্মৃতিমেদুর করে তুলল।

অমিতাভ চৌধুরী দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশের আমের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত করেছেন। ভাল লাগল পড়ে। শুনেছি উনি পুববাংলা থেকে এ বাংলায় আসা ব্যক্তি। তাই বাংলাদেশের আম সম্বন্ধে কিছু জানালে ভাল হত।

বিনয় বাগচী কলিকাতা

### সংশোধনী

১৪ সেপ্টেম্বর 'ঝাড়ফুঁক' সংখ্যায় 'রান্নাঘরে রেস্তোরাঁ' কলামে অঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের নাম ভুলক্রমে অঞ্জন চৌধুরী ছাপা হয়েছে। আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত।


**চিঠি পাঠাবার ঠিকানা**
লেটার বক্স, রোববার
সংবাদ প্রতিদিন
২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট,
কলকাতা ৭০০০৭২
*robbar.pratidin@gmail.com*
*Fax 22127977*

ফা

ফার্স্ট পার্সন

**—রেডিও'র ভেতর থেকে কাদের গলা আসে, ঠাকুমা?** ওরা কি রেডিও'র ভেতর থাকে?

আমার আর ঠাকুমার, দু'জনেরই দাঁত পড়ার বয়স। ফোকলা দাঁতে ঠাকুমা হাসল।

—বড় হও, বুঝবা।

এ কেমন এড়িয়ে যাওয়া উত্তর হল? আমি যে ভেবেছিলাম আমাদের খাবার ঘরের লাগোয়া করিডরে লেসের কভার ঢাকা রেডিওটার ভেতরে অনেক মানুষ থাকে, ছোট ছোট—লিলিপুটদের মতো।

তাদেরই গলায় খবর শুনি, নাটক শুনি আর গান যখন হয়, তখন আরও অনেকে পাশে বসে বাজনা বাজায়।

একদিন ইঁদুরে কেটে দিল রেডিও'র পেছনটা। রেডিও বিকল।

আর আমার শিশুমনে ইঁদুরটা প্রায় রুদ্রপ্রয়াগের চিতার মতোই ভয়ঙ্কর নরখাদক। রেডিও'র ভেতরে ছোট্ট মানুষগুলোকে নিশ্চয়ই খেয়ে ফেলেছে, তাই রেডিও আর চলছে না।

ক্রমে ঠাকুমার দাঁত আরও পড়ল আর আমার পড়া দাঁতগুলো গজাল।

রেডিও'র ভেতরের রহস্য তখনও আমার কাছে সরল নয়। কিন্তু ওর ভেতরের মানুষগুলোকে আমি আমার প্রত্যেকটা পড়ে যাওয়া দাঁতের মতোই ইঁদুরের গর্ত খুঁজে খুঁজে তাদের অবশ্যম্ভাবী বিনাশের ভবিতব্যে ঠেলে দিয়েছি। কেবল একটিই গলা বেঁচে রইল তাদের মধ্যে।

সেই অভ্রান্ত সুরেলা জাদুকণ্ঠ।

রেডিও ছেড়ে সে কেমন এক মায়াবী পথে এখন নতুন কেনা ট্রানজিসটর'টার মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

অমন আশ্চর্য গলার মানুষটির নামটা বড় সাদামাটা—লতা।

মা, পিসিমণির সম্বোধনে 'লতা মঙ্গেশকর' চিরদিন লতাই ছিলেন। যেন রোজকার চেনা পাশের বাড়ির মেয়েটি। সন্ধ্যা মুখার্জী, মান্না দে, শ্যামল মিত্র'র পাশাপাশি দু'জন মানুষ কেবলমাত্র তাঁদের প্রথম নামটুকু হয়েই বেঁচে রইলেন—হেমন্ত আর লতা।

ছোটবেলার 'সুভাষচন্দ্র' দেখতে গিয়ে বাড়ি ফিরলাম একটাই দৃশ্য সম্বল করে। বালক সুভাষচন্দ্র পথের ধারের ভিখারির গলায় 'একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি' শুনছে।

পরে জেনেছি, আসলে সে-ও আমার মতো লতা মঙ্গেশকরের গানই শুনছিল। কিন্তু ওই গ্রামের পথে, খোলা আকাশের নীচে, গ্রামবাংলার যন্ত্রানুষঙ্গে, লতা মঙ্গেশকরের সুরেলা আর্তি একজন অকাল শহিদের অন্তিম বিলাপকে আমার সেদিনের মনের মধ্যে এমন করে গেঁথে দিয়েছিল যে, বাকি ছবিটা জুড়ে নেতাজির নানারকম বীরকীর্তি—সব যেন কেমন পানসে হয়ে গেছিল। আজও আমার কাছে 'সুভাষচন্দ্র' ছবিটার প্রধান এবং প্রবল পরিচয় ওই একটাই গান।

এবং আমার ধারণা অনেক বাঙালি দর্শকই এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে একমত হবেন।

পরে শুনেছি, কোনও এক বিশেষ দেশাত্মবোধক অনুষ্ঠানে লতা মঙ্গেশকরের গলায় 'মেরে ওয়াতন কে লোগো' শুনে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কেঁদেছিলেন

ঘটনাটা শোনামাত্রই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।' প্রধানমন্ত্রী নেহরু, সিনেমার বালক সুভাষচন্দ্র আর আমি কোথায় যেন একটাই মানুষ হয়ে গিয়েছিলাম।

এখন ভাবলে মনে হয়, কিছুটা হয়তো বুঝতেও পারি যে নেহরু-উত্তর ভারতবর্ষে, এক নতুন ভারতপ্রতিমা নির্মাণে ইন্দিরা গান্ধি, 'মাদার ইন্ডিয়া'র নার্গিস-এর পাশাপাশি লতা মঙ্গেশকরের ভূমিকা বোধকরি কিছু কম নয়।

২

'আইকন' শব্দটা আজকাল বড্ড দায়সারাভাবে ব্যবহৃত হয় দেখি ঠিক যেমন Breaking News শব্দটার গুরুত্বটাও অমুক-তমুকের হাঁচি-কাশির খবর দিয়ে দিয়ে আটপৌরে হয়ে গিয়েছে।

'আইকন' শব্দটার মহার্ঘতা একটা সংস্কৃতির বিরাট সময়খণ্ড জুড়ে কেবল দু-একজন বিশিষ্ট মানুষ সম্পর্কেই ব্যবহৃত হতে পারে

লতা মঙ্গেশকর অবশ্যই সেই দু-একজনের অন্যতম একজন।

'তিলোত্তমা' যদি হয় রমণীর পুঞ্জীভূত লাবণ্যোৎকর্ষ, লতা মঙ্গেশকর শব্দটি তা হলে নিঃসন্দেহে ভারতীয় নারীর স্বরোৎকর্ষের প্রতীক।

প্রাক্-নারীবাদী যুগে, ভারতীয় সিনেমায় চিরন্তন ভারতীয় নারী কেবল অবিমিশ্র পবিত্রতা, বিশুদ্ধ প্রেম, অবিচল পতিনিষ্ঠা, চরম দুঃসহ ত্যাগ ও অসংশয়ী ঈশ্বরভক্তি দিয়ে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন মহারাষ্ট্রের এই লোকোত্তর কণ্ঠশিল্পীর গলা ব্যবহার করে।

বৈজয়ন্তীমালা, মীনাকুমারী থেকে শুরু করে শর্মিলা, রাখি, হেমা মালিনী কারুর কণ্ঠস্বর আলাদা করে আমাদের

অনেকেরই মনে নেই—আমরা তাঁদের গলার আওয়াজকে মনে রেখেছি লতা মঙ্গেশকরের কণ্ঠস্বর দিয়ে।

এর পেছনে অনেকটা ভূমিকা ছিল এই কিন্নরীকণ্ঠী 'আইকন'-এর।

ভারতের নারীত্বের লাবণ্যকে যিনি কেবল তাঁর কণ্ঠস্বর দিয়ে রূপায়িত করে ফেলেছেন।

লতা মঙ্গেশকর বললে একটাই ছবি মনে আসে—মাইকের সামনে শ্বেতবসনা, দুই বেণী করা, গায়ে আঁচলচাপা দেওয়া একজন সাধারণদর্শন মহিলা।

তাঁর সহস্রাধিক গানের ভুবন জুড়ে যেখানে প্রতিভাত হয়েছে নারীর নানা বিভঙ্গ, তাঁর নিজের ছবিটি এই বিশাল গানের জগৎ জুড়ে স্থির, অবিচল।

ফলে ক্রমশ এই ছবির চিত্রটি ফ্যাকাশে হতে হতে প্রায় প্রেক্ষাপটের ভূমিকা নিয়েছে, যার সামনে বিচিত্র বেশভূষায় নিত্যনবভঙ্গিতে নারীত্বকে নানাভাবে বিভূষিত করেছেন নানা নায়িকা। লতা মঙ্গেশকর অপূর্ব সুন্দরী বা নিদারুণ স্টেজ পারফরমার হলে এমনটি হত কি না সন্দেহ।

নেপথ্যকণ্ঠের অমন দুর্লভ সার্থক উদাহরণ বোধকরি একমাত্র এই গায়িকা।

৩

লতা মঙ্গেশকরের প্রথম বাস ছিল আমার রেডিও'র মধ্যে।

ধীরে ধীরে তিনি এসে আস্তানা গাড়লেন আমাদের ট্রানজিস্টরে। তারপর রেকর্ড প্লেয়ারের তলার বাক্সটায় রাখা কালো কালো চাকতিগুলোতে।

পুজো আসছে। শৈশবের অনেক স্মৃতি মাথায় করে।

পাড়ার পুজোয় মাইকে গান বাজানোর দায়িত্বটাই তখন যেন এক বিরাট শৈল্পিক অধিকার।

অন্যমনস্কতার ছুতো করে লতা মঙ্গেশকরের একই গান পরপর বাজিয়ে ফেলেছি—কেবল নিজে আবার শোনবার লোভে। এমন বেশ কয়েকটি শারদীয়া চোট্টামি এখনও বেশ মনে আছে।

এই যে সেদিন কোন চ্যানেল-এ ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে বললাম—

পুজোর আনন্দ ছোটবেলাতে অন্যরকম ছিল।

তখন আকাশে আরও নীল ছিল, রোদে আরও সোনা ছিল।

ঠাকুমার দুধসাদা কাপড়ে ছিল কাশফুলের নরম। আর মা'র নতুন শাড়িগুলো ক'দিনের মধ্যেই যেন মা'র গন্ধটা পেয়ে যেত।

যেটা বলা হয়নি সেটা এখন বলছি, আমার ছোটবেলায় প্রতি পুজোয় নতুন করে পুজোর গান গাইতেন লতা মঙ্গেশকর।

সেদিনের সেই শরতের আকাশে, ধূপধুনোর গন্ধে, ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে মিশে থাকত এক মারাঠি মহিলার গলা, যাঁকে ছাড়া বাংলার পুজো আজ কেমন যেন পানসে হয়ে গিয়েছে।

ঋতুপর্ণ ঘোষ

# ভা

ভালো-বাসার বারান্দা

নবনীতা দেবসেন

## সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব

**আরে লতা না হলে আমাদের বাল্যপ্রেমে কোনও জৌলসই থাকত না!** রবীন্দ্রনাথ? হ্যাঁ, বাড়িতে একা তিনিই রাজত্ব করেন, কিন্তু রাস্তায়? আমার মতো দুষ্টু মেয়েরা তো শুধু ওই গোখেল ইশকুলের আর ভালো-বাসা বাড়ির শুভ্র ব্রাহ্ম বাতাসেই মানুষ হইনি, আমরা অনেকখানি মানুষ হয়েছি রাস্তাতেও। আমাদের ট্রেনিং সম্পূর্ণই হত না যদি রাস্তার ট্রেনিংটা না পেতুম। তার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে হয়নি, ভালো-বাসা বাড়ির বারান্দাই ছিল যথেষ্ট। পুজোর প্যান্ডেলের গান, রেডিও সিলোন, এঁরা সবাই আমাদের গুরুগিরি করেছেন। তবে না আমরা এক এক খানি চিজ হয়েছি? হ্যাঁ, আমি জানি বেশি স্মার্ট যারা তারা বলবেন, 'ওঃ লতা? হ্যাঁ, ও গায় ভাল। কিন্তু আসলি চিজ আশা ভোঁসলে!' আরও স্মার্ট যারা তারা বলবেন, 'আহা, গুরু দত্ত যদি ওয়াহিদা রহমানের সঙ্গে অমন ধারা না করতেন তা হলে আজ কোথায় লতা, কোথায় আশা, আমাদের গীতা দত্ত হতেন একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। একই আধারে লতার মহিমা আর আশার মোহময়তা!' আমার মতো সন্ধ্যাপ্রেমীরা বলবে, 'হায়! গানের ইন্দ্রধনুটিতে তো জ্যা রোপণই হল না ঠিক করে! লক্ষ্যভেদের আসরে সন্ধ্যা নামলেনই না। দেখে নেওয়া যেত কে কোথায় দাঁড়িয়ে!'

কিন্তু সে সব যে যাই বলুক, এই একভাবে ষাট বছর ধরে দেশের মানুষের প্রাণের মাঝখানে বসে রয়েছেন, ঠাকুর্দাদা থেকে নাতি পর্যন্ত তাঁর খপ্পরে। পঞ্চাশ বছর আগেও নায়িকার গান গেয়ে পাগল করে দিতেন, আজও নায়িকার গান গেয়ে ফাটিয়ে দিচ্ছেন। অথচ ভারতবর্ষের সংগীতের সংসারে ট্যালেন্টের অভাব নেই। আধুনিক যুগোপযোগী গলা নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন অনেক তরুণী গায়িকা, আশার অসামান্য সেক্সি ভয়েসের নকলে উঠে এসেছেন কেউ কেউ, সম্পূর্ন উল্টো শিবিরের সেক্সি হাস্কি কণ্ঠে উষা উত্থুপ রয়েছেন, তবুও তো কই লতার রমরমা কমছে না? রাগ হবে না লতার ওপরে? রাগ তো হওয়ারই কথা! এ সেই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পরম দুঃখে লেখা কল্লোল যুগের কবিদের ব্যাজস্তুতি ভরা রবিস্তবের মতো 'পথ রুধি রয়েছেন রবীন্দ্র ঠাকুর।' তেমনি নতুন গায়িকাদের পথ রুধি তো রয়েই গিয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। আজও তেমনি কারুকাজ গলায়, তেমনি দীপ্তি, তেমনি মাধুর্য। বয়স তাঁর গানকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এ কি আর অমনি অমনি হয়? আমরা সেদিন সন্ধেবেলায় আড্ডা দিচ্ছি, আমার এক স্নেহভাজনের ঘরে বসে, বাবলার গলায় কর্কট রোগ হয়েছে, আমি স্থির বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই সেরে উঠবে, কিন্তু সেই প্রসঙ্গে ধূমপান, শরীরের অযত্ন ইত্যাদি অপ্রিয় প্রসঙ্গগুলো উঠেছে। ওর বন্ধু প্রবীর বললেন লতা মঙ্গেশকরের কথা। কারুর সঙ্গে একটু জোরে কথা বলেন না, রেগে গেলেও চেঁচিয়ে ওঠেন না, কোনও অবস্থাতেই নিজের কণ্ঠের ক্ষতি যাতে না হয় সেই বিষয়ে সচেতন। ভাবা যায়? লতার একটি ইন্টারভিউতে তিনি পড়েছিলেন লতা বলেছেন তাঁর কণ্ঠস্বরই তাঁর কাছে ঈশ্বর, তাকে সেবাযত্ন করা তাঁর কর্তব্য। তিনি কখনও এমন কিছু করেন না তাঁর গলায় যাতে আঘাত লাগে।

শরীরের যত্নের অপ্রিয় প্রসঙ্গটা বদলে দিতে চেয়ে একদার ধূমপায়ী, এখনও তরুণ, রুগি নিজেই তাড়াতাড়ি অন্য একটা গল্প বললেন, টিভিতে সুরকার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি সাক্ষাৎকারের কথা তুলে। একবার রেকর্ডিং-এর সময়ে একটা বিশেষ জায়গায় গানটি তিনি যেভাবে গাওয়াতে চান, লতা ঠিক সেইভাবে গাইছেন না, কিন্তু যতবারই পরিচালক তাঁকে সবিনয়ে বলছেন, 'আপনি ওইখানটা তো ঠিক ওইভাবে করলেন না?' লতা অবাক হয়ে প্রতিবারই তাঁকে বলছেন, 'কেন, ওইভাবেই তো গেয়েছি?' অত বড় শিল্পীকে বেশি ঘাঁটালেন না সংগীত পরিচালক, অতৃপ্তি মেনে নিলেন। তারপরে যখন বাজনা টাজনা যুক্ত হয়ে গানটি রান্না সম্পূর্ণ, পাতে দেওয়ার জন্যে তৈরি, অভিজিৎ আশ্চর্য হয়ে শুনলেন, লতার গলায় ঠিক তিনি যেটি চেয়েছিলেন, অবিকল সেই পরিস্থিতিটি তৈরি হয়েছে। কণ্ঠস্বরের 'রেসোন্যান্সের' সম্পর্কে লতার এত স্পষ্ট ধারণা, উনি নিজে ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন ওই অংশটুকু পরে কেমন শোনাবে, সংগীত পরিচালক তা ধরতে পারেননি।

আরে অমনি অমনি কি লতা মঙ্গেশকর হওয়া যায়?

আমার তো 'লতা' নামটা বললেই অনুষঙ্গ হিসেবে মনে পড়ে যায় একটা অদ্ভুত মতো গান, সেরকম গান তার আগে কোনওদিনও শুনিনি। 'লারে লাপ্পা লারে লাপ্পা' নামক সেই বিতিকিচ্ছিরি সুর আর বিতিকিচ্ছিরি কথার গানে তখন কলকাতার আকাশ বাতাস মূর্ছিত। আর রুচির এই অধঃপতনে আমাদের মা-বাবারা ক্রোধে ও বিবমিষায় মুহ্যমান। সেই প্রথম 'কালচার শক' লাগা কাকে বলে দেখলুম। আমরা তখন নেহাৎ ছোট ছোট স্কুলের ছেলে মেয়ে। রবীন্দ্রসংগীতের বাইরে তখনও শুনেছি কেবল পঙ্কজ মল্লিকের, আর সায়গলের সুমধুর হিন্দি গান, যার নাম রেকর্ডে ছিল 'গীত'। লারে লাপ্পা এল একটা পুরনো সুরেলা সুরের বাঁধ ভেঙে দেওয়ার সুনামি ঝড় হয়ে। আমার সঙ্গে লতার সেই প্রথম পরিচয়। আশা এবং রফিও সেই গানে যুক্ত ছিলেন, সেটা পরে জেনেছি। পরবর্তী জীবনে রফির আমি অনড় ভক্ত থেকে গিয়েছি। কিন্তু লতার নামটাই আমার মনে লেগে রইল সেই থেকে।

এটা মনে হতেই আমার মাথায় একটা খেলা এল। আপনারা তো জানেনই খেলা পেলে আমি আর কিছু চাইনা। লতার নাম শুনে কার কোন গানটা মনে পড়ে? তার মধ্যে কোনটা সবচেয়ে বেশি লোকের মনে পড়ে? ব্যস। যাকে সামনে পাচ্ছি তাকেই চেপে ধরছি আর প্রশ্ন করছি। সাম্পেল সার্ভের স্টাইলে। সামনাসামনিতে কুলোল না, তখন টেলিফোনে। মানে শুধু কলকাতা নয়, দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু, হায়দ্রাবাদ, ভুবনেশ্বর, যেমন খুশি। ভেবেছিলুম বোধহয় শ্রোতাদের বয়েস অনুযায়ী

একটা রুচির তালিকা প্রস্তুত করা যাবে, এ ছাড়া অন্য বিভাজনে যাইনি। শ্রেণি তো নয়ই। অবাক হলুম, মাত্র একটি, কী দুটি গানে পুনরুক্তি পেয়ে। প্রায় সবাইকারই নতুন নতুন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন গান মনে আসছে। কী যে অসাধারণ বৈভব বিছিয়ে রেখেছেন, সুরের কী বিচিত্র বিস্তার এই শিল্পীর! শুধু নিজের স্বরেই নয়, এই বিস্তারের মাত্রার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে শ্রোতাদের বৈচিত্র্যময় স্মৃতিতে, বহুবর্ণ রুচিতে। খেলতে গিয়ে এইবারে টের পেতে শুরু করেছি সবে আমার মোটে লতা পাতায় আঙুল লাগানো উচিত হয়নি।

বাড়ি থেকেই শুরু। কানাই বড়ো ভাল পল্লীগীতি গায়। কিন্তু কদাচ হিন্দি গান গুন গুন করতেও শুনিনি।' 'কানাই, লতা মঙ্গেশকর বললে তোমার কী গান মনে পড়ে?' সে পরোটা বেলতে বেলতে মুহূর্ত মাত্র সময় না নিয়ে বলে, "ওই যে সরফরোশিকি তমন্না ওই গানটা কি লতার? ওটা খুব ভাল লাগে। আর 'সারে জহাঁসে আচ্ছা'।" ভড়কে যাই। আমি ওর কাছে এমন ঝটপট উত্তর আশা করিনি। 'সারে জহাঁসে আচ্ছা' তো ইকবালের লেখা, না দিদি? "হ্যাঁ, আর 'সরফরোশিকি তমন্না আজ হামারে দিলমে হ্যায়' সাভারকরের লেখা, আন্দামানের জেলের সেলে বসে। শ্রাবন্তী সেলটা দেখে এসেছে।" 'সত্যি?' কানাই খুব তৃপ্ত যে তার প্রিয় গানের এমন দৃপ্ত ইতিহাস আছে।

বাবুসোনা নামছিল সিঁড়ি দিয়ে। 'লতার গান কোনটা?' বলতেই সে সিঁড়ির মাথায় অ্যাটেনশনে দাঁড়িয়ে পড়ে মুখস্থ বলতে শুরু করে দিল 'আয়ে মেরে ওয়াতনকে লোগো, জরা আঁখমে ভর লো পানি,' 'হুয়েছে, হুয়েছে, থ্যাংকিউ।' 'কুরবানি' অবধি বলা শেষ করে সে লাফাতে লাফাতে নেমে গেল। নীলু, তুই কিছু জানিস? 'নাঃ, আমি জানি রুনা লায়লা আর উষা উত্থুপের দু-একটা। লতা আশা জানি না ' নীলু খুব স্পষ্ট বক্তা। নেক্সট? বউমা। হিন্দি গান? বউমা হেসেই গড়িয়ে পড়ল। কিচ্ছু জানে না। শিবু তথৈবচ। 'আমরা তো দিদি শান্তিনিকেতনে বড় হয়েছি, তখনকার দিনে ওসব লারে লাপ্পা গান শুনি টুনি নি। আজকাল সবাই সব শোনে ' শ্রাবন্তী? সে তো আবার গান-জ্ঞানী, ফোনে তার মুখ খোলাবো? থাক। বাড়িতে ফিরুক

তার চেয়ে দিল্লিতে ফোন করি, পিকোকে। পেয়ালাপিরিচের শব্দ, বাজনা, কথাবার্তার মধ্যে মেয়ে ফোন ধরে। 'তোরা কি কোথাও পার্টিতে?' 'হ্যাঁ গো।' 'আচ্ছা লতা মঙ্গেশকর বললে তোর কোন গান মনে পড়ে রে?' মেয়ে এক মিনিট থমকালো। তুমি কি বললে লতার গান? মেয়ে ফিসফিসিয়ে এক লাইন গেয়ে ওঠে, 'হাওয়ামে উড়তা যায়ে মেরা লাল দুপাট্টা, মলমলকা জি মোরা লাল দুপাট্টা মলমলকা ও জি, ও জি! চলবে?' 'দারুণ চলবে থ্যাংক্স,' ফোন রেখে দেবো,' হ্যালো, হ্যালো, মা?' ' কী রে?' 'কেন এটা জিগ্যেস করলে?' ' একটা লেখার জন্যে, সবাইকে প্রশ্ন করছি কার কোন গানটা মনে পড়ে। তুইও জিগ্যেস কর না ওখানে তোর বন্ধুদের?' 'যাঃ কী যে বলো না মা।'

দিল্লি নেক্সট আক্রমণ মুন্নুকে। একই প্রশ্ন। মুন্নু একটু চুপ করে থেকে বলে 'অ্যায় মেরে ওয়াতনকে লোগো।' এরপরে মুন্নুর কন্যে পুষাই। সে একটা রেস্তোরাঁতে ডিনার খাচ্ছে হবু দেবরের সঙ্গে। পুষাই খুব সুন্দর গান গায়। কিন্তু সেও বললে 'অ্যায় মেরে ওয়াতনকে লোগো' আর তার দেবর ছোকরা বললে, পাকীজার গান, 'চলতে চলতে।' গুড! নতুন গান। নতুন ফ্যামিলি। পুষাই-এর বাবা শুয়ে পড়েছেন, আজই বিদেশ থেকে ফিরেছেন। মুন্নুর প্রশ্ন শুনে ঘুমন্ত গলায় বললেন, 'অ্যায় মেরে ওয়াতনকে' বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়লেন। মুন্নুদের হোল ফ্যামিলির, তিনজনেরই যে আলাদা করে ওই একটিই গান সবার আগে মনে পড়ল এতে পারিবারিক বন্ধনের অসামান্যতা প্রমাণ পেল।

দিল্লিতে পরবর্তী আকর্ষণ, আভেরী। একটা অস্ত্রোপচার হয়ে সে বেচারি শয্যাশায়ী। প্রশ্ন শুনেই মিহি গলায় গেয়ে উঠল, 'না, যেও না, রজনী এখনও বাকি আরও কিছু দিতে বাকি বলে রাতজাগা পাখি, না যেও না' অবিকল লতার মতো চিকন করে। অপূর্ব গাইল। তা হলে তুই ভাল আছিস, আভেরী। এই মনের মতো প্রশ্নটাতে তুই ভাল হয়ে গেলি।

তারপরে দিল্লির ফোন এল। পিকো।—'মা?'—'কী রে?' মেয়ের গলা উজ্জ্বল।—"জিগ্যেস করেছি, মা, চন্দ্রিকা গ্রোভারের প্রথমে মনে পড়ল 'আয়েগা আনেওয়ালা', তারপরে, 'প্যার কিয়া তো ডরনা ক্যা', আর অনুরাধা কাপুরের মনে পড়ল, 'বরখা বাহার আয়ি', তারপরে 'জানে কেয়া তুনে কহা' তারপরে বন্ধুরা সবাই মিলে ভীষণ লতার গান গাওয়া হচ্ছে এখন। মনে হল তোমাকে বলি।"

এরপরে হিন্দুস্থান পার্কে দাদাভাইকে ফোন। 'দাদাভাই? লতা মঙ্গেশকর বলতে তোমার কোন গানটা

মনে পড়ে?' 'ও গানটান আর মনে নেই রে, বুড়ো হতে চললুম, লতা ফতা সব ভুলে গেছি।' 'সে কী? পিকোলোকে জিগ্যেস করতে সে পর্যন্ত বলে দিল 'হাওয়ামে উড়তা যায়ে' অথচ ওদের সময়ের গানই নয়। মনে আছে, দাদাভাই আমরা সেই যে চারভাইবোনে মিলে বরসাত দেখতে গেলুম? আমরা তখন তিনজনে স্কুলে তুমি একা কলেজে ঢুকেছো। ধর্মতলার কোনও একটা সিনেমা হলে? এতদূর শুনেই দাদা গলা ছেড়ে গেয়ে উঠল 'হাওয়ামে উড়তা যায়ে' যার পরে একের পরে এক বরসাত, মহল, নাগিন, পাকীজা, আনারকলি,' 'বুড়ো হতে বসা' দাদাকে থামায় কে?

'বরসাতের' পরে আমরা ভাইবোনেরা 'মহল' দেখতে গিয়েছিলুম। মামাবাড়ি থেকেই এটা সম্ভব ছিল, আমাদের বাড়ি, অর্থাৎ মা জননী হিন্দি সিনেমা বিরোধী পার্টি। কিন্তু তাঁর বাপের বাড়ি তা নয়। আয়েগা'র সুরের দোলা আমাদের চোখে বুকে কানে, এবং মর্মে গেঁথে ছিল। 'তোমাদের বিয়ের পরে আমরা সবাই মিলে 'গাইড' দেখতে গিয়েছিলুম, না দাদা?' ব্যস শুরু হল গাইডের সেই সব অপ্রতিরোধ্য গান!

পরের প্রশ্ন দিদিভাইকে। দাদা আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড় দিদি আরও পাঁচ। দিদিভাই রোজ তিনটে কাগজে শব্দ সন্ধান করেন তাই মহা টরটরি। সেই টরটরিদিদি অলস সুরে বললেন, 'লতা? কী জানি রে কোনটা কার গান!' একটু মৃদু লাঠি চার্জের ধরনে বকুনি দিতেই দিদিভাই সপ্রতিভ হয়ে বলে ওঠেন, 'ওহো, ওই তো আমার প্রিয় গান, 'না যেও না, রজনী এখনও বাকি', তারপরে ধর, 'সাতভাই চম্পা', কী দারুণ? তারপরে ওই 'আকাশ প্রদীপ জ্বলে দূরের তারার পানে চেয়ে' ততক্ষণে দিদিভাই-এর গলায় সুর এসে গিয়েছে, লতার ম্যাজিক জেগে গিয়েছে। দিদিভাই নস্ট্যালজিক মোড-এ ঢুকে পড়েছেন।

দিদিভাই-এর দেখাশোনা করে রেবা। রেবা বিহারি মেয়ে। 'রেবা, তোমার কোন গানটা মনে পড়ল?' রেবাকে ভাবতে হয় না। 'তন ডোলে মেরা মন ডোলে' আর 'আ জা রে পরদেসি, ময় তো কবসে খড়ি ইসপার' সঙ্গে সঙ্গে পড়া বলার মতো বলে দিল সেই মেয়ে। দু'টিই আমার প্রিয় গান। এই খেলাটা আমার খুব ভাল লাগছে!

পরবর্তী স্টপ বেঙ্গালুরু। দাদামণি আর বুদু ক্লাসিকালের ভক্ত বলে বাপ ছেলে হিন্দি আধুনিক শোনেন না, তবে হ্যাঁ, লতা মঙ্গেশকর গান গায় বলে শুনেছেন বললেন। তখন তাদের সপাটে পরিত্যাগ পূর্বক তাদের পত্নীদের কাছে যাই, ও ঠিকঠাক প্রতিক্রিয়া পাই। ইরা বললে হিন্দি গান তো শুনিনি, জানিসই তো আমাদের মা জননীকে, বেম্মো আর রোমান ক্যাথলিক মিশেল দেওয়া রুচি, তবে হেমন্তের সঙ্গে গাওয়া লতার ওই 'মধুগন্ধে ভরা' রবীন্দ্রসংগীতটি ভারি ভাল লাগে। তার বউমা অসাধারণ গায়িকা শ্রমণা, সে বলে ওঠে বিমল রায়ের 'বন্দিনী' ছবির 'মোরা গোরা রংগ লেইলে' গুলজারের লেখা প্রথম গান, আমার ওটা খুব ভাল লাগে।'

ইতিমধ্যে শ্রাবন্তী ফিরে একটু শুয়েছে। প্রশ্ন শুনেই বলল, 'জাগো মোহন প্যারে জাগো' অথবা তার বাংলা, 'জাগো মোহন প্রীতম' কিন্তু ভজনের চেয়ে ঢের ভাল লাগে 'চঞ্চল ময়ূরী এ রাত' ক্লাসিকাল সুরে, তাছাড়া ওই সব 'লগ যা গলে, ফির য়ে হাসি রাত হো না হো', 'মেরা সায়া', মুকেশের সঙ্গে সেই 'কভি কভি মেরে দিলমে খয়াল আতা হ্যায়', কিংবা 'মেঘা ছায়ে আধি রাত' শ্রাবন্তী এবারে সোৎসাহে উঠে বসেছে। এবারে প্রপাতের মতো গানাবলি ঝরবে। 'বেশ হয়েছে মা, আর চাই না থ্যাঙ্ক ইউ, এবারের মতোন ওতেই আমার কাজ চলবে।'

এবারে জাল গুটোনো। বেশ রাত হয়েছে। একটা কাজে জ্যোৎস্না ফোন করতেই তাকে প্রশ্ন করি। সে উত্তর দিল " 'সাত ভাই চম্পা জাগোরে।' ওই গানটার সঙ্গে আমার বড় হওয়া জড়িয়ে আছে দিদি। পুজো মণ্ডপে ওই গানটি বাজত, দশ এগারোর আমি, ভিতরে ভিতরে কেমন কেঁপে উঠতাম, মাইকে গানটা সে বাজাতো বলে সেই মাইকওয়ালারই প্রেমে পড়ে গেলাম পুজোর ক'টা দিন! লতার আরেকটা গানও আমার বুকের মধ্যে ঘোরে 'যা রে যা রে উড়ে যা রে পাখি " বলে সে প্রথম স্তবকটা গায়। বুক কাঁপানো সুরের গানটা আবার মনে পড়ে গেল। শুনিনি কত দিন?

পরের মুহূর্তে চিত্রার সঙ্গে ফোনে লতা-প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। আর যাবে কোথায়? চিত্র একের পরে এক গেয়ে চলল লতার গানের লাইন প্রত্যেকটাই বাংলা। 'প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে' বলেই বলল 'আসলে গাওয়া উচিত' প্রেম বারবারই এসেছিল সরবে!' তারপরে সেই 'কে প্রথম কাছে এসেছি, কে প্রথম ভালবেসেছি/তুমি/না আমি', তাতেও না, 'অন্তর মম চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব তোমার সাথে' ইত্যাদি চটুল গান (যা আশার গলাতে হয়তো আরও মানাতো!) শুনিয়ে, অবশেষে দিদিভাই-এর মতো 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে' গেয়ে, চিত্রা তার আসরের গ্র্যান্ড ফিনালেতে এল 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি!' কী ভক্ত পেয়েছে বলো? অবাঙালি মেয়ে?'

নীলুর বর অমিত অনেক রাতে তার দোকানের কাজ সেরে ফেরে, রাত এখন একটা। অমিতকে কেন বাদ দেব? অমিতকে পাকড়াই সে কবিতা লিখতে, ঠাকুর গড়তে পারে অমিত জানাল তার মতে, "লতার সব চেয়ে বেস্ট সুপারহিট, দিদি ওই ক্ষুদিরামের গানটা, 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি'।"

এত এত বাংলা গান রেকর্ডে গেয়েছেন লতা? অনেক সের বাঙালি গাইয়ের সারা জীবনের রেকর্ডিংয়ের চেয়ে ঢের বেশি। আমি অবাক হয়ে ভাবি বাংলা গানের ক্ষেত্রে লতার কথা আমার কখনও মনে থাকে না কেন? অথচ আমারই তো কতগুলো প্রিয় গান গেয়েছেন বাংলাতে খেলার শেষে নম্বর হিসেব করে দেখলুম, 'আয় মেরে ওয়াতনকে লোগো' সবচেয়ে বেশি বার, তারপরে 'একবার বিদায় দে মা,' 'না যেও না,' 'সাত ভাই চম্পা', আর 'আকাশপ্রদীপ জ্বলে', এই গানগুলিকে পেয়েছি দু'বার করে। বাকি প্রত্যেকটি অগুন্তি গান উল্লিখিত হয়েছে মাত্র একবার একবারই। লতার ভান্ডার অফুরান! হয়তো ব্যতিক্রম 'হাওয়ামে উড়তা যায়ে', আর 'লারে লাপ্পাটা', ওগুলো দাদাভাই মহোল্লাসে গেয়ে দিয়েছিল আমার বলার পরে। এখন চিন্তা, সেগুলো একবার ধরা হবে, না দু'বার?

লেখা শেষ। রাত্রির দ্বিতীয় যাম। বৃষ্টি পড়ছে। ঘুম নেই। মন কেমন করছে। 'মেঘা ছায়ে আধি রাত, বৈরন বন গয়ি নিন্দিয়া—বতা দে ম্যায় ক্যা করু—?'

২০.০৯.০৮

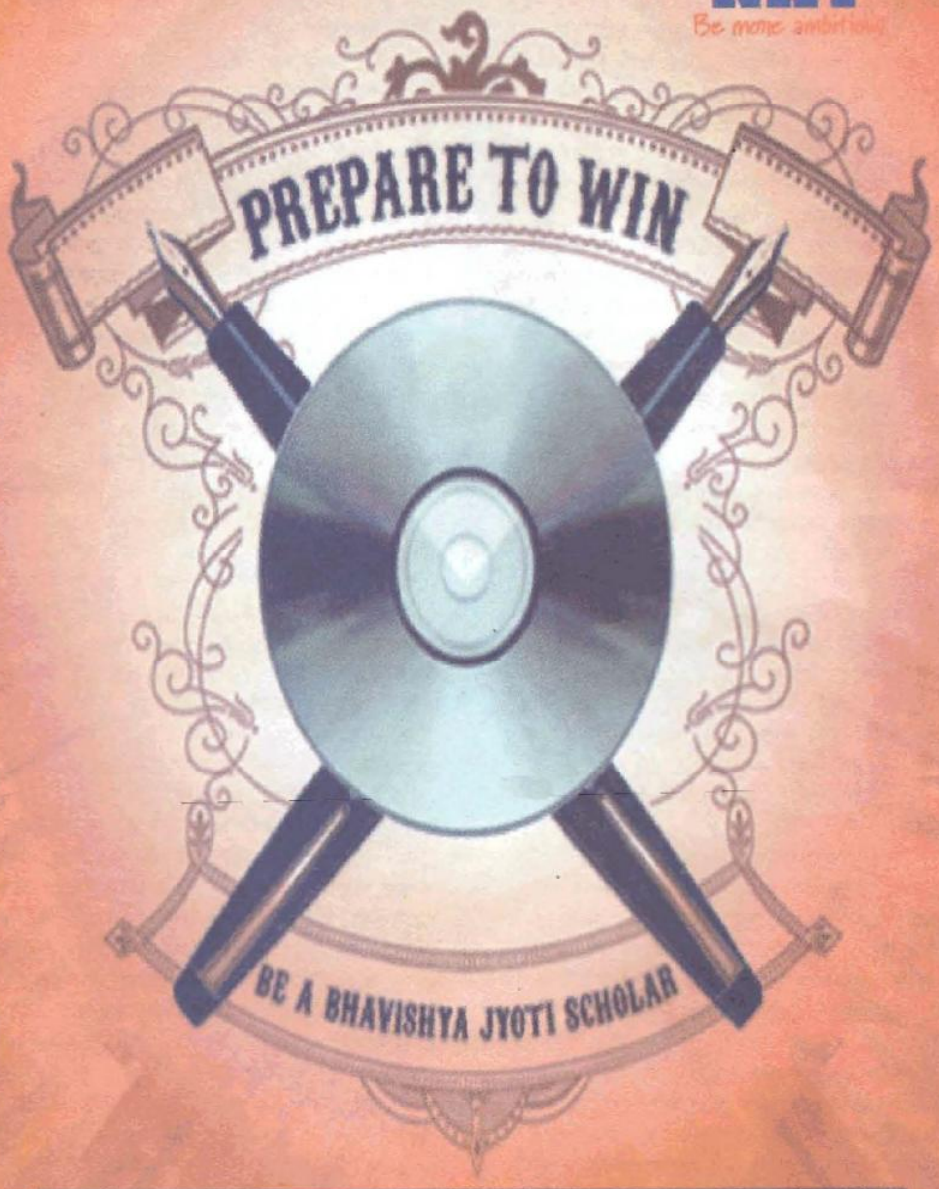

NIIT
Be more ambitious
PREPARE TO WIN
BE A BHAVISHYA JYOTI SCHOLAR
Announcing the 18th
Bhavishya Jyoti Scholarship
20,000 merit based fee waivers of upto Rs. 40,000 to be awarded
NIIT
THE 18TH BHAVISHYA JYOTI
SCHOLARSHIPS - 2008

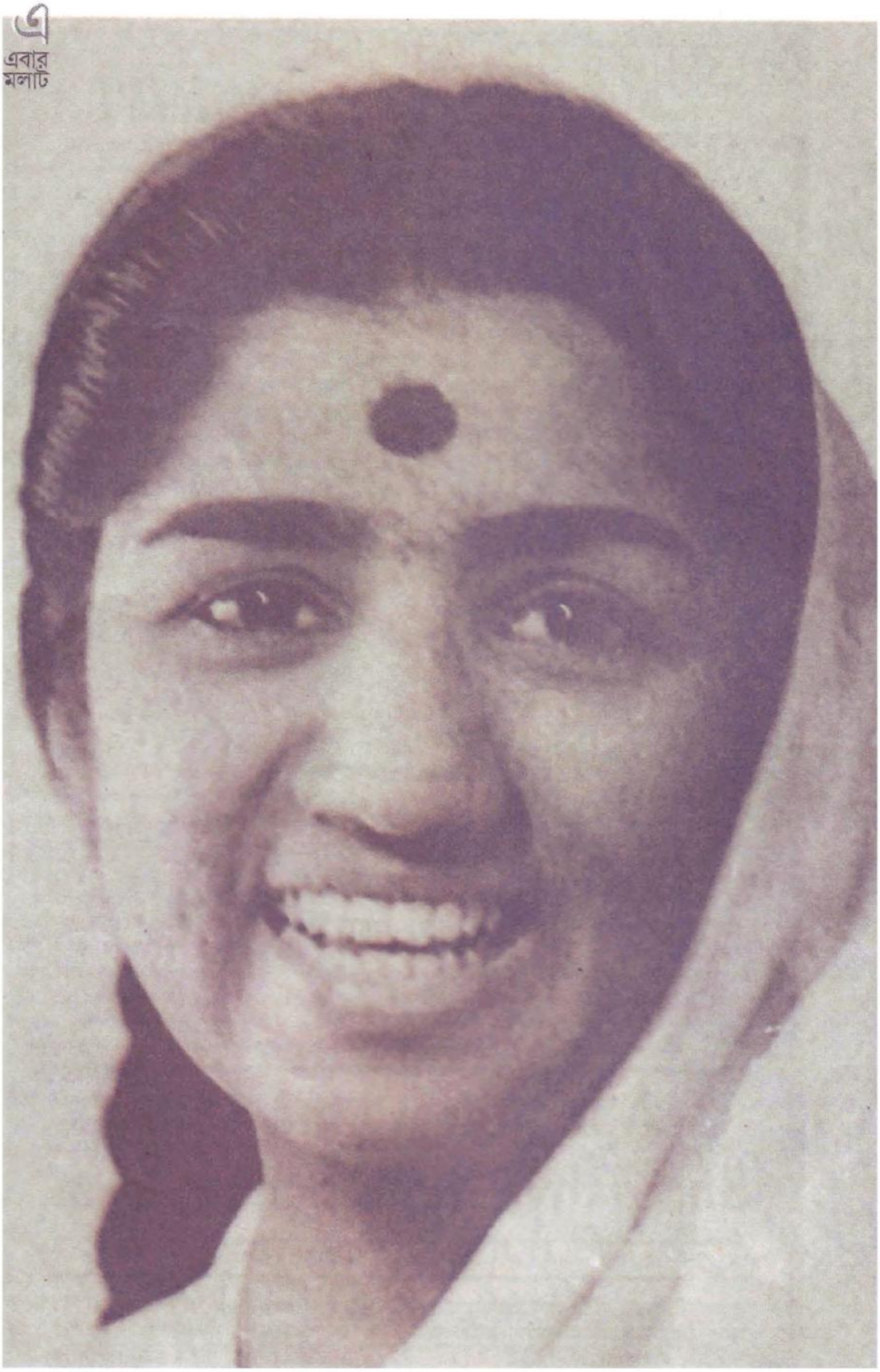

# ও কোকিলা

প্রমীলাকণ্ঠ'র সমার্থ তিনি। সুরেলা সরগমে তিনিই ঈশ্বরী।
গান এমন জীবনসঙ্গী কখনও পেয়েছে কি?

অতনু চক্রবর্তী

১

**'বিশ শতকের তিনটি বিস্ময়কর ঘটনা হল, মানুষের চাঁদে পদার্পণ, বার্লিনের দেওয়াল ভাঙা এবং লতা মঙ্গেশকরের জন্ম'—বলেছিলেন 'গজল কিং' জগজিৎ সিং।** এই মহার্ঘ জন্মটি হয়েছিল ২৮ সেপ্টেম্বর (আর এক আশ্চর্য সমাপতন—এদেশে পপুলার মিউজিকের দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ আশা ভোঁসলের জন্মও এই সেপ্টেম্বরে এবং দু'জনে একই পিতামাতার সন্তান)। লতাকে 'অষ্টম আশ্চর্য' বলেছেন আমজাদ আলি খান। লতাই অবিসংবাদী 'ভয়েস অফ ইন্ডিয়া'। 'লতা'—এই ছোট, নিরীহ নামটির পেছনে রয়েছে এক ডাইনোসোবাল ইমেজ, পাহাড়প্রমাণ অ্যাচিভমেন্ট এবং গগনচুম্বী খ্যাতি ও সাফল্যের সাতকাহন। লতাপ্রশস্তিতে অভিধানের যাবতীয় উচ্ছ্বাসী বিশেষণ ইতিমধ্যেই ব্যবহৃত। এই সেপ্টেম্বরে লতা পা দিচ্ছেন আশিতে। এই মাইলফলকের সামনে দাঁড়িয়ে কী প্রতিক্রিয়া বা জীবনের কাছে তাঁর আর কী পাওয়ার আছে এমন প্রশ্নের জবাবে স্বভাবসিদ্ধ বিনম্র ভঙ্গিতে, মৃদুস্বরে লতা বলেন—"আমার যা পাওয়ার যোগ্যতা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি আমি। ঈশ্বরের অশেষ কৃপার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। আমি 'ডেস্টিনি'-তে বিশ্বাস করি। আমার এই কর্ম এবং ফল পূর্বনির্দিষ্ট ছিল।" নিজের সাফল্যকে এভাবেই ব্যাখ্যা করেন লতা।

লঘুসংগীত সম্রাজ্ঞী লতা আজ উপচে পড়া প্রাপ্তির কেন্দ্রে বসে যত সহজে এ কথা বলতে পারেন ততখানি মসৃণ ছিল না তাঁর উত্থানের আদিপর্ব! উনিশশো উনপঞ্চাশ থেকে পরবর্তী চার দশক লতার উত্থান সরলরৈখিক—সেখানে বাইরের তেমন কোনও সংঘর্ষ বা সংগ্রাম গোচরে আসে না। এই পর্বে নিজেকে ক্রমশ উৎকর্ষে পৌঁছে দেওয়ায় ছিল তাঁর চ্যালেঞ্জ। তাঁর সাফল্যের উষ্ণীষে নতুন নতুন পালক গোঁজা হয়ে উঠেছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। 'প্রভু কুঞ্জ'-এর এই বাসিন্দা হয়ে উঠেছিলেন প্লে-ব্যাক সাম্রাজ্যের প্রভু।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে ফিল্মি সংগীতের বাতাসে গুঞ্জন ছিল—লতা মঙ্গেশকরের হাঁচি হলে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির সর্দি লেগে যায় কিংবা উল্টোটা, লতার সর্দি হলে ইন্ডাস্ট্রি হাঁচতে থাকে। নিজেকে এমন অপরিহার্য করে তুলেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। দিগ্বিজয়ের সে-ইতিহাস লেখা আছে ফিল্মি গানের ডিস্কোগ্রাফি'তে। ক্রমিক এই সাফল্যের ধারাকাহিনিতে ঘটনার সমারোহ, কিন্তু সংঘাত নেই। যে কারণে লতার সাফল্যকে তাঁর সংগ্রামী জীবনের পটভূমিতে স্থাপন করলে তা হয়ে ওঠে আকর্ষণীয়। ষাট বছরেরও বেশি সময় ধরে প্লে-ব্যাক ভূখণ্ডে সক্রিয় লতার কণ্ঠ, তাঁর উপস্থিতি আজও শিহরিত করে অসংখ্য শ্রোতা বা শিল্পীকে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, নিউইয়র্ক থেকে নিউজিল্যান্ড, ত্রিনিদাদ থেকে দুবাই, 'লতা' নামটিই একরাশ সুরেলা অনুষঙ্গ আনে। এই গ্রহে বোধহয় এমন কোনও লোকালয় নেই যেখানে কখনও না কখনও লতাকণ্ঠের কোনও গানের কলি উচ্চারিত হয়নি। প্রবীণরা যখন 'মন ডোলে মেরা তন দোলে' বা 'জিন্দগি উসিকি হ্যায়', 'মোহে ভুল গয়ে সাবরিয়া'র মতো গানের স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন; প্রৌঢ় শ্রুতি যখন গুনগুন করেন, 'আজারে পরদেশি', 'লগ যা গলে', 'পিয়া তোসে নয়না লাগে রে' বা 'তেরে বিনা জিন্দগি সে কোই'; যুবক-প্রাণ তখন 'দিদি তেরা দেবর দিবানা' থেকে 'কভি খুশি কভি গম' বা 'বীরজারা'-র সম্মোহনে আচ্ছন্ন।

লতা এখন আর প্লে-ব্যাকের শিরোনাম নন, কিন্তু প্লে-ব্যাকের ইতিহাসে তিনিই শীর্ষনাম এবং এই অতিবয়সেও তাঁর গান গাইবার আগ্রহ কমেনি। এখনও তিনি রেকর্ডিং ফ্লোরে এলে সে-ঘটনাটি হয়ে ওঠে ইভেন্ট। অবসরের বয়স বহু পেছনে ফেলে রেখে এখনও তিনি প্রবলভাবে সক্রিয় ব্যক্তিত্ব। বয়স নিয়ে লতার তেমন দুর্ভাবনা নেই। জন্মদিনে তাই তিনি ফুর্তিতে বলতে পারেন, 'জীবন থেকে আর একটা বছর কমে গেল, এ ছাড়া জন্মদিনে অন্য কোনও বিশেষ উপলব্ধি নেই। আমি মনের দিক থেকে এখনও তরুণী গান গাইতে পেলেই খুশি হই। যতদিন সুযোগ থাকবে গাইব আর কোনও কাজই আমি তেমনভাবে পারি না, তাই গান থেকে আমার মুক্তি নেই।'

লতার গান থেকেও মুক্তি নেই লঘুসংগীতের শ্রোতাদের। বিশ শতকের কিন্নরকণ্ঠীর গানে কান পাততে হবে একুশ শতকের শ্রোতাকেও। হালফিলের গানবাজনা যতই লঘু বা ক্ষণস্থায়ী হবে ততই দীর্ঘ হবে লতা-ইমেজ। ছোটখাটো চেহারা, সাদা পোশাকের নম্রভাষী এই গায়িকা ফেনোমেনন হয়ে আছেন ফিল্মি গানের ভূখণ্ডে। ওস্তাদ থেকে কমনম্যান সকলেই লতাকণ্ঠে সাফল্যের মালা পরিয়ে, তাঁকে আলটিমেট হিসেবে সিলমোহর লাগিয়ে দিয়েছেন। লতা হয়ে উঠেছেন অবিসংবাদী আইডল, অন্য শিল্পীদের পরিমাপের ব্যারোমিটার। ঘটনাচক্রে লতার নিকটতম শৃঙ্গটির বাসও তার নিকটতম কামরায়। স্বেচ্ছানির্বাসনে যাননি লতা, গড়পড়তা প্রতিভাদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে নিজেকে মহান করেছেন।

হালফিলের গানবাজনা লতাকে আর তেমন টানে না। তাঁর সুখস্মৃতি অতীত ঘিরে, তাই কথায় কথায় তিনি ফিরে যান পঞ্চাশ-ষাটের দশকে। লতার মুখে যখন বুলি ফুটেছে, তখনও সিনেমা কথা বলতে শেখেনি। সে ছিল থিয়েটারের গানের রমরমার দিন। সেই থিয়েটারের গান ছিল আশৈশব গানপ্রেমী লতার কমবয়সের বিনোদন।

গানের জন্য থিয়েটারে যাওয়ার দরকার হয়নি লতার, থিয়েটারের গানই এসেছে লতার কাছে। লতার পরিবার থেকেই থিয়েটার পুষ্টি পেয়েছে দীর্ঘকাল।

'ছেলেবেলায় আমাদের ছিল যাযাবরের জীবন। বাবা নাটকের দল নিয়ে এ শহর থেকে ও শহরে ঘুরে বেড়াতেন আর আমরা দলের লটবহরের মতোই সঙ্গে যেতাম', এটাই লতা মঙ্গেশকরের উল্লেখযোগ্য শৈশবস্মৃতি। কারণ তাঁর বাবা দীননাথ মঙ্গেশকর ছিলেন মারাঠি নাট্যমঞ্চের এক যুগন্ধর প্রযোজক, গায়ক-অভিনেতা।

দীননাথরা বিখ্যাত 'হার্দিকর' বংশের উত্তরসূরি। আদি বাসভূমি গোয়ায়। তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ কেউ পর্তুগিজ আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে শহিদ হয়েছেন। বাড়ির পাশেই ছিল মঙ্গেশদেবের মন্দির। কুলদেবতা মঙ্গেশের সূত্রেই পরিবারের পদবির সঙ্গে যোগ হয় 'মঙ্গেশকর'। বংশের পুরুষদের আদি পদবি ছিল 'ভাট' অর্থাৎ পূজারী ব্রাহ্মণ এবং দেবতাকে রক্ত দিয়ে স্নান করানোর সূত্রে তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল 'অভিষেকী' খেতাব। উনিশ শতকের শেষ দিকে এই পরিবারের প্রধান ছিলেন ভিখমভট অভিষেকী। তিনি এবং তাঁর ছেলে গণেশভট মঙ্গেশদেবের মন্দিরে প্রবচন দিতেন।

গণেশভট এবং তাঁর সঙ্গীতজ্ঞ মারাঠি স্ত্রী যেসুবাইয়ের প্রথম সন্তান দীননাথ। এ সব তথ্য লতা পেয়েছেন তাঁর কাকা, বালুকাকা অভিষেকীর কাছ থেকে, যিনি পুরোহিতের কাজেই ব্যস্ত ছিলেন, ভাইঝি লতা বিখ্যাত হয়ে যাওয়ার পরেও। লতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হৃদয়নাথ সাগরপারে গিয়ে জাত খুইয়েছেন এমন

চোখের আলোয় দেখেছিলেম, শৈশবে লতা

বিশ্বাসে, গোঁড়া পুরোহিত বালুকাকা, ইউরোপ ঘুরে আসা হৃদয়নাথকে মন্দিরে ঢুকতে দেননি এমন ঘটনাও ঘটেছে।

বড়দের কাছে অধীর আগ্রহ নিয়ে লতা শুনেছেন তাঁর 'আইডল' বাবার অতীতকথা। ছেলেবেলা থেকেই দীননাথের কণ্ঠে গান আসত স্বাভাবিক স্ফূর্তিতে। পড়শিরা বলত—একে নাটকের দলে দিয়ে দাও, নাম করবে। তখন কলের গানের শৈশব, গাইয়েদের জন্য রেডিও বা সিনেমার মতো কিছুই সুলভ ছিল না, ফলে নাটকই ছিল প্রধান মাধ্যম। কিন্তু যেসুবাই ছেলেকে অনিশ্চিত নাট্যজগতে ঠেলে না দিয়ে বরং আসরে বাজানোর জন্য সারেঙ্গি শেখার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। কিছুকাল শেখার পর গুরু একদিন শিষ্যকে মদ কিনে আনার ফরমায়েস দিয়েছিলেন। সুরা সম্পর্কে ভীতি থেকে দীননাথ সারেঙ্গি নিয়ে সেই যে গুরুগৃহ ছাড়লেন আর সেখানে ফেরেননি। অথচ অদৃষ্টের কী পরিহাস, যে সুরার থেকে দূরে থাকার জন্য তিনি একদা গুরুকে ত্যাগ করেছিলেন, সেই সুরার প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরতা-ই একদিন দীননাথের জীবনীশক্তি দ্রুত কেড়ে নিয়েছিল। সারেঙ্গি ছেড়ে দীননাথ তবলা শিখতে শুরু করেন, পাশাপাশি শুনে শুনে শেখা গান গাওয়াও চলতে থাকে। জিনিয়াস দীননাথের গাইবার ঢং ছিল সেকালের নাট্যদলের দিকপাল গায়ক-অভিনেতা বাল গন্ধর্বের মতো। তাঁর গান শুনে তবলার গুরু এবং সতীর্থরা দীননাথকে পরামর্শ দিয়েছিলেন গানে মন দিতে। পরে এহজেবুয়ার কাছে বিশুদ্ধ রাগসংগীতের তালিমও নিয়েছিলেন দীননাথ। কিন্তু তার আগেই তিনি গায়ক-অভিনেতা হিসেবে রীতিমতো বিখ্যাত। মহারাষ্ট্রের তৎকালীন কয়েকটি নাট্যদল শুনেছিল দীননাথের গান এবং দেখেছিল পুরুষ ও নারী উভয় চরিত্রে দীননাথের দক্ষ অভিনয়। ফলে সকলেই চাইছিলেন এই প্রতিভাবান আত্মবিশ্বাসী শিল্পীকে দলে পেতে। দীননাথের গান শুনে বাল গন্ধর্ব নাকি বলেছিলেন, মঙ্গেশিগ্রাম থেকে বোম্বাই পর্যন্ত টাকা বিছিয়ে দিতে পারি যদি ছেলেটি আমার দলে যোগ দেয়। চোদ্দ বছরের বালক দীননাথকে দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের থিয়েটার কোম্পানি যে কোনও মূল্যে পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। দীননাথও চাইছিলেন আত্মপ্রকাশের মঞ্চ, তাই তিনি প্রথমেই পূজারী পদবি অভিষেকী ত্যাগ করে কুলদেবতার নাম অনুসারে মঙ্গেশকর (মঙ্গেশ দেবতার কর অর্থাৎ হাত) পদবি নিয়ে ভ্রাম্যমান নাটকের দলে ঢুকে পড়লেন।

কির্লোস্কর সংগীতমণ্ডলী দলের সদস্য হিসেবে মহারাষ্ট্র, দিল্লি এমনকী কলকাতাতেও হিন্দি এবং উর্দু নাটকে অভিনয়, গান করেছেন দীননাথ। আঠেরো বছর বয়সে তিনি তৈরি করেন নিজস্ব নাট্যদল 'বলবন্ত সংগীতমণ্ডলী' এবং তাঁদের প্রথম প্রযোজনা 'শকুন্তলা'। ক্রমশ দীননাথ এবং তাঁর নাট্যদলের সমৃদ্ধি ঘটতে লাগল, বাড়তে লাগল প্রভাব এবং প্রচার।

বাইশ বছর বয়সে মারাঠি নাটকের অন্যতম ব্যক্তিত্ব দীননাথ নিজের পছন্দে বিয়ে করেন শেঠ হরিদাসের কন্যা উনিশ বছরের নর্মদাকে। উনিশশো বাইশ সালে অনুষ্ঠিত সে-বিয়ের তিনদিনের আনন্দ অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দীননাথের নাট্যদলের নতুন নাটক 'কাঁটো মে ফুল'।

বিয়ের চার বছর পরে দীননাথ এবং নর্মদার একটি

www.simoco.net
simoco
MOBILES
Desh ki dhadkan ko sun
Chota Ustad
SM 399
1.8" Colour Display
VGA Camera
LED Torch Light
FM Radio / Mp3 / Mp4
Rs.3899
Dual SIM
SM 1101
Dual SIM / Dual Standby
Camera / FM Radio
Bluetooth / Mp3 / Mp4
Polyphonic / Mp3 Ring Tone
Rs.4499
Music Masti
SM 233
FM Radio / Mp3 Music Player
Polyphonic / Mp3 Ring tone
Colour Display
LED Torch
Rs.2499
Music Masti
SM 299
Pitch shift / FM Radio
Music & Movie Player
Audio & Video Recording
Colour Display / Camera
Rs.2999
Music Masti
SM 633
FM Radio / Mp3 / Mp4 / Camera
Polyphonic / Mp3 Ring Tone
Bluetooth / Black List Function
500 phone Book / SMS
Rs.5599

কন্যাসন্তান জন্মেছিল, তার তেমন বাঁচার আশা ছিল না। কিন্তু দীননাথের শ্যালিকা সেবন্তীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বেঁচে গেল শিশুটি, তবে বাঁচানো গেল না নর্মদাকে। এরপর সেবন্তী ক্রমশ বিপত্নীক দীননাথ এবং নবজাতকের নির্ভরতার কেন্দ্র হয়ে উঠলেন, কালক্রমে দীননাথের ঘরণীও হন। সেবন্তীর নতুন নামকরণ হয় 'শ্রীমতী'। সন্তানদের আদরের ডাক 'মাঈ'।

তিরিশ বছরে পা দেওয়ার আগেই মাস্টার দীননাথ খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছেন। একসময় তাঁকে মারাঠি নাটকের শ্রেষ্ঠ গাইয়ে-অভিনেতার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। অসাধারণ সুরেলা কণ্ঠ ছিল দীননাথের—বিশাল রেঞ্জ। নাট্যসংগীতের পাশাপাশি রাগসংগীতেও তিনি যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। শুধু কণ্ঠস্বরটি ছিল হালকা চালের। একজন হিতৈষী দীননাথকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, প্রতিদিন এক চামচ করে ব্র্যান্ডি পান করলে তাঁর কণ্ঠস্বরের ওজন বেড়ে যাবে। এই উপদেশের সূত্র ধরেই দীননাথের জীবনে অনুপ্রবেশ ঘটে ঘাতক সুরার, যা তাঁর জীবনীশক্তিকে দ্রুত ক্ষয় করার পথ প্রশস্ত করেছিল। তবে সে ধ্বংসের আগে নির্মাণের কাজটি সেরে ফেলেছিলেন দীননাথ। মারাঠি নাটকের ক্ষেত্রে রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। মুম্বইয়ে ব্রিটিশ আমলের রাজকীয় প্রেক্ষাগৃহ রয়্যাল অপেরা হাউসে দীননাথের নাটক অভিনীত হয়েছে। সন্ধের বদলে ম্যাটিনি বা দুপুরের শোয়ের সেটাই ছিল সূত্রপাত। দীননাথের 'ভাববন্ধন' নাটকের টিকিটের দাম ছিল পাঁচ টাকা, প্রায় আশি বছর আগের সেই পাঁচ টাকা কতখানি মহার্ঘ, তা সহজেই অনুমেয়।

সেসময় বিস্তর অর্থ উপার্জন করেছেন দীননাথ। সাংগলি'তে তেরোটি ঘর-সহ যে দোতলা বাড়িতে থাকতেন তিনি, তার সামনের পথটি এখন 'দীননাথ রাস্তা' নামে পরিচিত। অসংখ্য ব্যাঙ্কে তাঁর টাকা জমত সেই আমলে দীননাথের একটি নাটক প্রযোজনার ব্যয় ছিল প্রায় সত্তর হাজার টাকা। গোয়ায় আম এবং কাজুবাদামের চাষ ছিল দীননাথের। দু'লক্ষ টাকা দিয়ে একটি পাহাড় কিনেছিলেন দীননাথ, তার আভিজাত্যের ঘোষণা হিসেবে। তিরিশ বছর বয়সের দীননাথ স্বপ্ন দেখতেন, 'যদি আমার পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত লক্ষ্মীদেবীর কৃপা অব্যাহত থাকে, তা হলে পর্তুগিজদের হাত থেকে গোটা গোমন্তক (গোয়া) আমি কিনে নিতে পারব।'

জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশ্বাসী দীননাথের কিছু ভবিষ্যদ্বাণী মিলে গেলেও, নিজের ভবিষ্যৎ দেখতে পাননি তিনি। উনিশশো উনত্রিশ সালের আঠাশে সেপ্টেম্বর, শনিবার রাত দশটা তিরিশ মিনিটে ইন্দোরে, শ্যালিকার বাড়িতে দীননাথ-শ্রীমতীর প্রথম সন্তানের জন্ম। দীননাথের প্রয়াত স্ত্রীর সন্তানের নাম রাখা হয়েছিল 'লতা'। সেসময় দীননাথের একটি জনপ্রিয় নাটক অভিনীত হত—'ভাববন্ধন'। ওই নাটকের নায়িকার নাম ছিল 'লতিকা'। লতিকার ভূমিকায় অভিনয় করতেন স্বয়ং দীননাথ। সেই নামই রাখা হয়েছিল দীননাথের প্রথম সন্তানের—লতা। সেই শিশু কন্যাটি ন'মাস বয়সে মারা যায়। নতুন স্ত্রী সন্তানসম্ভবা হলে দীননাথ বলেছিলেন, সন্তানের নাম রাখা হবে আগের মেয়েটির নামেই। মাঈ বলেছিলেন, যদি পুত্রসন্তান হয়, তার নাম হবে 'হৃদয়', কন্যাসন্তান হলে 'লতা'। তেমনই হয়েছিল। জ্যেষ্ঠ কন্যার নাম লতা এবং একমাত্র পুত্রের নাম হৃদয়নাথ। জন্মের পর লতার কোষ্ঠী বিচার করে দীননাথ বলেছিলেন, 'এই মেয়ে বিধাতার অকৃপণ আশীর্বাদ নিয়ে জন্মেছে। এ একদিন খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছবে।' বলেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর সেই কন্যা লতা মঙ্গেশকর যেখানে পৌঁছেছেন, এতদূর বোধহয় তাঁর কষ্টকল্পনাতেও ছিল না। দীননাথের পুত্র-কন্যারা গান গাইবে এটা নির্ধারিত হলেও তাঁর দুই কন্যা এভাবে ইতিহাস গড়বে, প্লে-ব্যাক ভূখণ্ডের অল টাইম গ্রেট, চার দশকের শাসক হয়ে উঠবে, এতদূর ভাবা সেদিন কারও পক্ষেই সম্ভব ছিল না।

২

'আমার ছেলেবেলা সম্পর্কে প্রথম স্মৃতি যা আজও ম্লান হয়নি, সেটা আমার ঠাকুমার বাড়ি। ছোট্ট সেই শহরটার নাম ধালনার। ইচ্ছে থাকলেও সেখানে বেশিদিন থাকা হত না আমার, কিন্তু যখনই যেতাম, দেখতাম নানিমা আপনমনে গান গাইছেন। নানিমার একটা পুজোর ঘর ছিল সেখানে সন্ধেবেলা বাড়ির সবাই জড়ো হত। নানিমা হারমোনিয়াম নিয়ে ভক্তিমূলক গান গাইতেন, ভজন-আরতির গান তা ছাড়া রাতে আমাদের ঘুম পাড়ানোর জন্য গান গাইতে গাইতে সেই গানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নানা গল্প করতেন আমি নানিমার সঙ্গে সবসময় লেগে থাকতাম বলতাম, আমাকে ওই গানটা শেখাও, সেই গল্পটা বলো নানিমা রান্না করতে করতে, কখনও বা আমাকে স্নান করানো বা খাওয়ার সময় সেইসব গান গাইত। আমি সে'সব ভক্তিগীত আর লোকসুরে ডুবে যেতাম।' লতা মঙ্গেশকর স্মৃতি খুঁড়ে সুদূর অতীত থেকে এভাবেই তুলে আনেন গানের সঙ্গে তাঁর প্রথম আত্মীয়তার ছবি। সুরপ্রীতি লতার আজন্ম, তাঁর যখন ছ'মাস বয়েস, তখন বাবার বাজানো সারেঙ্গি শুনে আধো আধো সুরে তার প্রতিধ্বনি তুলে দীননাথকে অবাক করে দিয়েছিলেন লতা। শিশুকন্যাকে কোলে বসিয়ে দীননাথ গান গাইতেন, তাই শুনে লতা সঙ্গে সঙ্গে গাইতে শুরু করত। বাবা-মেয়ের এই খেলা চলত মাঝে মাঝেই। সেদিনই দীননাথ মেয়ের অসাধারণ

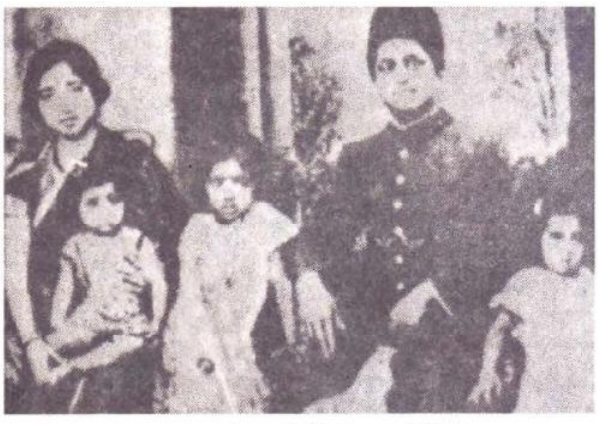

মা-বাবা ও বোনদের সঙ্গে (লতা বাঁ দিক থেকে দ্বিতীয়)

হাঁটি হাঁটি পা পা, বয়স তখন তিন বছর

পাঁচে পা

সুরবোধ এবং স্মরণশক্তির পরিচয় পেয়েছিলেন। এভাবেই খেলতে খেলতে লতায় জড়িয়ে গিয়েছিল সুর। দীননাথ মঙ্গেশকর নাটকের দল নিয়ে মাঝেমধ্যেই নানা শহরে যেতেন। চার বছর বয়স থেকে লতা সে দলের সদস্য। একবার বাবার নাটকের দলের সঙ্গে ইন্দোরে গিয়েছিলেন শিশু লতা। সেখানকার রাজবাড়িতে সকালের সানাই শুনে, হুবহু সেই সুর গুনগুনিয়ে শুনিয়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন সবাইকে।

দীননাথ মঙ্গেশকর যখন রেওয়াজ করতেন বা ছাত্রদের তালিম দিতেন, ছোট্ট লতা আশপাশে খেলতে খেলতেই শুনতেন। একদিন বাবার অবর্তমানে তাঁর ছাত্রদের ভুল সুরের চলন শুনে লতা তাদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন সঠিক সুর। তখন লতার ছ'বছর বয়স। এই ঘটনা দীননাথকে এতটাই উদ্বুদ্ধ করেছিল যে, পরের দিন থেকেই তিনি শুরু করে দিলেন মেয়ের প্রথাগত সংগীত শিক্ষা। সরগম আর বন্দিশে জড়ানো শুরু হল ভবিষ্যতের নক্ষত্র লতার। ততদিনে দীননাথ আরও দুই কন্যার জনক হয়েছেন মীনা এবং আশা।

পাঁচ বছর বয়সে লতার জীবনে আসে প্রথম বিপর্যয়। ভয়ানক গুটি বসন্তে আক্রান্ত হন তিনি। রোগটি ক্রমে এমন ভয়াবহ আকার নিয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যাবে কি না সে ব্যাপারে সন্দেহ দেখা দেয়। যদিও বা বাঁচানো যায়, কোনও না কোনও অঙ্গহানি যে হবে, সে-ব্যাপারে সকলেই নিশ্চিত ছিলেন। দু'টি ধারণাই অমূলক প্রমাণিত হয়। তবে ওই নিদারুণ বসন্ত অক্ষয়চিহ্ন রেখে গিয়েছে লতার মুখাবয়বে। সে-সময় প্রায় তিন মাস আতঙ্কে কাটিয়েছে দীননাথ দম্পতি। মায়ের সেবা, বাবার উৎকণ্ঠা এবং ভবিষ্যৎ গণনা পেরিয়ে যখন দেখা গেল লতার অঙ্গহানি বা কণ্ঠস্বরের কোনও বিকৃতি ঘটেনি, তখন আনন্দে কন্যার পুনর্জন্মের উৎসব পালন করা হয়েছিল। এরপর থেকে শুরু হয়েছিল সংগীতে লতার যথার্থ তালিম। রাগসংগীতের পাশাপাশি থিয়েটার-সিনেমার গানও সাবলীল গলায় তুলে নিতেন লতা। সাংগলির অপেরা হাউসে থিয়েটারের শতবার্ষিকী উৎসবে বাবার নাটকের গান এবং কে এল সায়গলের 'ম্যায় ক্যা জানু ক্যা জাদু হ্যায়' গেয়ে বিপুল প্রশংসা পেয়েছিলেন শিশুশিল্পী লতা। সায়গলের গানের প্রেমে লতা মজেছিলেন সেই বয়সেই। ছ'বছর বয়সে পরিবারের বড়দের সঙ্গে 'চণ্ডীদাস' ছবি দেখতে গিয়েছিলেন লতা। ছবির শেষে লতা বায়না ধরেছিলেন আমি ওই লোকটাকে বিয়ে করবে। ওই লোকটা ছিল 'চণ্ডীদাস' ছবির নায়ক-গায়ক কে এল সায়গল। বায়না ক্রমশ কান্নাকাটিতে পৌঁছল, কোনও মতে তাঁকে বাড়ি নিয়ে আসা হল। বোঝানো হল, এখন তোমার বিয়ের বয়স হয়নি। তখন লতা ঘোষণা করেছিলেন 'বড় হয়ে আমি সায়গলকে বিয়ে করব।' এই ঘটনা আজও লতার মনে আছে। লতা জীবনে বিয়ে করেননি। সায়গলের সঙ্গে তাঁর দেখাও হয়নি। কিন্তু সায়গলের গান লতার বেড়ে ওঠার পেছনে অন্যতম প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। লতার জীবনে প্রথম আদর্শ যদি হন দীননাথ মঙ্গেশকর, দ্বিতীয়জন অবশ্যই সায়গল। শুধু সায়গলের ছবি নয়, সেদিন ছেলেমেয়েদের সিনেমা দেখাটাই দীননাথ মঙ্গেশকরের পছন্দ ছিল না। অধিকাংশ সিনেমা রুচির বিকৃতি ঘটায় এমন ধারণায় দীননাথ ছেলেমেয়েদের সিনেমা থেকে দূরত্বে রাখার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। এখানেও জ্যোতিষী-পিতা কন্যার ভবিষ্যৎ দেখতে ব্যর্থ হয়েছেন।

কন্যা জ্যোতিষ্ক হয়ে বিরাজ করবে এটা তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, কিন্তু সেই আকাশটা সে সিনেমার গান হবে, তা টের পাননি। সিনেমা নানাভাবে লতাকে জড়িয়েছে—অভিনেত্রী, গায়িকা, সংগীত পরিচালক, প্রযোজক। বাবা না চাইলেও মেয়ের সঙ্গে সিনেমার যোগসূত্র ছেলেবেলা থেকেই। বাবা নাটকের দল নিয়ে বাইরে গেলে কন্যারা মাঝেমধ্যে রুপোলি পর্দার উত্তেজনার স্বাদ নিতেন। শুধু সিনেমা দেখার উত্তেজনাতেই সীমাবদ্ধ থাকত না মঙ্গেশকর কন্যাদের আগ্রহ। লতা-আশা-মীনা তিন বোনের বিনোদন বা ইনডোর গেম ছিল, বাড়ি ফিরে সিনেমার পছন্দসই দৃশ্যের 'রিমেক'। সেই উন্মাদনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে পরিণত বয়সেও লতা মজা পান—"মীনা আর আশা সিনেমার নাটকীয় দৃশ্যের সংলাপ মুখস্থ করে নিত আর আমি মনে গেঁথে নিতাম গান। সিনেমায় যখন কোনও গানের দৃশ্য আসত আমরা উত্তেজনায় টানটান হয়ে যেতাম। আজও ভাবলে আশ্চর্য লাগে ওই ছোট্ট বয়সে একবার মাত্র দেখা সিনেমার ডায়লগ, গান কী করে আমরা মনে রাখতাম। এখনও মনে পড়ে মারাঠি ছবি 'সন্ত তুকারাম' দেখে বাড়ি ফেরার পরের অ্যাডভেঞ্চার। ছবিটার একটা দৃশ্য ছিল, যেখানে দেখানো হয়েছিল বীজ পোঁতার পর গাছের শীষ বেরনো, প্রথম পাতা, মুকুল থেকে শস্য-ভরা গাছের পরিণত পর্যায়। বাড়িতে সেই দৃশ্যটা অভিনয়ের খেলা শুরু করলাম আমরা তিন বোন। আমি গানটা ধরলাম। আশা আর মীনা প্রথমে শস্যের বীজ হয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ল এরপর চারা হয়ে একটু একটু করে মাথা তুলে বসল। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে ওরা গাছ হয়ে গেল আর হাত নাড়িয়ে গাছের ডগা হয়ে দুলতে লাগল হাওয়ায়। যতক্ষণ ওরা এই অঙ্গাভিনয় করল আমি গানটা চালিয়ে গেলাম।

ওই ছবির তিনটে দৃশ্য আমরা বাড়িতে করার চেষ্টা করেছি। দ্বিতীয়টি সন্ত তুকারামের মৃত্যু। ঘরের মধ্যে শ্মশান কোথায় পাব, শেষ পর্যন্ত বাথরুমে সে দৃশ্যটি করতে হল। আর একটি অংশ যেখানে সন্ত তুকারাম স্বর্গে পৌঁছে গিয়েছেন, ভক্তরা পৃথিবীতে শোক করছে। ঘরের কোণায় তোষকের স্তূপ করে তার ওপর খানকতক বালিশ চাপিয়ে একটা উঁচু জায়গা তৈরি হল, সাদা শাড়ি পরে সেখানে আমি আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে, আর মেঝেতে মীনা আর আশা কান্নাকাটি করে চলেছে এভাবেই খেলাটা করেছিলাম আমরা।

সিনেমায় সংলাপের যেটুকু মনে থাকত তার সঙ্গে নিজেদের মন থেকে ডায়লগ তৈরি করে নিয়ে আমরা খেলাটা চালাতাম। কোনও দৃশ্যে তিনজনের বেশি চরিত্র থাকলে আমরা খুড়তুতো ভাই পান্ধারীনাথ কোলাপুরেকে দলে নিতাম, ব্যাস এই চারজন। কোনও রূপকথার দৃশ্য নিয়ে খেললে আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট আশা সাজত রাজকুমারী। মীনার চরিত্র হত কুচক্রী দুষ্ট রানি। আমি অবতীর্ণ হতাম ত্রাতার ভূমিকায়, যে দুষ্টের দমন করে রাজকন্যাকে উদ্ধার করবে। রাজা আর ভিলেন দু'টো চরিত্রই করত পান্ধারীনাথ। যখন সে চুলটা বাঁ দিকে আঁচড়ে নিত তখন ভিলেন, আবার চুল ডান দিকে আঁচড়ে নিয়ে সেই হয়ে যেত রাজা।

এইসব ঘরোয়া নাটকে প্রচুর গান হত যার অধিকাংশই বাবার গাওয়া নাটকের গান। আসলে গান গাওয়ার একটা উপলক্ষ চাই বলেই হয়তো এ সব করতাম। যেমন নতুন কোনও গান শিখলে সেটা শোনাবার ছটফটানি থাকত। তখন দুই বোনকে ডেকে বলতাম গ্রামোফোন শুনবি? চুপ করে বোস রেকর্ড বাজাই। এরপর কানে আঙুল ঢুকিয়ে ঘুরিয়ে গ্রামোফোনের সুইচ ঘোরাতাম আর অন্য হাত দিয়ে পিনের হ্যান্ডেল তুলে নেওয়ার ঢঙে নিজের মাথাটাকে রেকর্ড বানিয়ে তার ওপর বসিয়ে দিতাম আঙুল, সেই সঙ্গে শুরু করে দিতাম গান।

এ সব কাণ্ডকারখানা হত যখন বাবা বাড়িতে থাকত না তখন। আরও কতরকমের দুষ্টুমি করেছি ছেলেবেলায় ভাবলে হাসি পায়। এটা সেটা রং করা আমার একটা খেলা ছিল। একদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে মেক আপ করতে গিয়ে থুতনিতে লাল রং লেগে গেল খানিকটা। সেটাকেই খানিক বাড়িয়ে কমিয়ে বেশ একটা কেটে যাওয়া ক্ষত মতো হল। তারপরই কান্না জুড়ে দিলাম আমি, পড়ে গিয়েছি, কেটে গিয়েছে, ব্যথা ইত্যাদি। সবাই ছুটে এসে যখন ঘিরে ধরল আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

ছেলেবেলায় মশলাদার খাবার খুব পছন্দ করতাম। একদিন রাতে সবাই মিলে খেতে বসেছি। মা দারুণ একটা মাংস রান্না করেছে। সবার থালাতেই পড়েছে সেটা, কিন্তু অত কমে আমার মন ভরবে না, তাই একটা ফন্দি করলাম, নিজের মাংসটা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলাম—'মাংসটা খেতে গিয়ে মনে পড়ল কাল রাতে আমি একটা নোংরা স্বপ্ন দেখেছি, দেখেছি আমি রান্না করা ইঁদুর খাচ্ছি। যখন ইঁদুরটায় দাঁত বসিয়েছি টের পেলাম রান্নাটা বাজে হয়েছে, ইঁদুরের গা থেকে রক্তের মতো কী একটা গড়িয়ে পড়ছিল আমার মুখ বেয়ে। এই পর্যন্ত শুনেই ভাইবোনেদের খাওয়া লাটে উঠে গেল। একজন তো বমি পাচ্ছে বলে উঠেই গেল। কেউই আর খেতে পারছে না। মা-ই আমাকে বকুনি দিয়ে বললেন, কেউ খাবার ফেলে উঠবে না। কিন্তু ওরা আর খেতে পারল না। অগত্যা আমিই ওদের থালা থেকে মাংসটা তুলে নিলাম। না হলে খাবার নষ্ট হবে। আমরা গাছে উঠে পেয়ারাও পেড়েছি। ছোট ভাই হৃদয়নাথ এসবে ছিল না কোনওদিনই, ওর পায়ে একটা সমস্যা ছেলেবেলা থেকেই এ জন্য ও বই নিয়ে বসে থাকত বা একা একাই গান গাইত এইসব দুষ্টুমির জন্য মাঝে মধ্যে নালিশ গেলে বাবা শাসন করতেন বাবা ডাকলেই আমরা কেঁদে ফেলতাম। বাবা মারতেন না কখনও মা মাঝে মধ্যে কিল-চড় দিয়েছেন মায়ের হাতে তেমন জোর না থাকলেও মায়ের হাতের ভারি বালাটা লেগে গেলে বেশ ব্যথা হত। বাবা আমাকে জীবনে একবারই শাস্তি দিয়েছিলেন। আমি একটা গান তালের সঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না, বাবা আমাকে আলমারির মাথায় বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যতক্ষণ তালে গাইতে না পারবে ওখানেই বসে থাকতে হবে। অন্য ব্যাপারে বাবা খুবই উদার ছিলেন। কাপ, ডিস ভাঙা আমার কাছে একটা মজার ব্যাপার ছিল। কাপ আর ডিস দিয়ে তাল তুলতে গিয়ে যেগুলো ভেঙে যেত, ডুবিয়ে দিতাম জলে। বাবার কাছে একদিন নালিশ করলেন মা। বাবা বললেন, পুরনো

**শোরুম ও অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রঃ**

কলকাতা: লিন্ডসে স্ট্রিট (২২৮৬১৫১১), ফ্রি স্কুল স্ট্রিট (২২৮৬১৫০৬), কলেজ স্ট্রিট শোরুম (মার্কাস স্কোয়ার - ২২১৯৭৯৮৪), বেহালা মার্কেট (২৪৬৮১৩৪১), গড়িয়া বসু মার্কেট (২৪৩০৩০৭৬) | হাওড়া (২৬৪১০৬০৮) | ডোমজুড় (২৬৭০৫৩৫৪) | নৈহাটী (২৫০২ ৩২৯৩) বর্ধমান | দুর্গাপুর | আসানসোল | বহরমপুর | পুরুলিয়া | জামশেদপুর | ধানবাদ | রাঁচি | হাজারিবাগ | ভাগলপুর | মুজফ্‌ফরপুর | পাটনা | কটক | ভুবনেশ্বর | আগরতলা | বারানসী | রায়পুর | গুয়াহাটি | দিল্লী

Genesis 2494

কাপ ভেঙেছে ভাঙুক, নতুন কিনে নেওয়া যাবে।

বাবার আমি খুবই ন্যাওটা ছিলাম। সারাদিনে ছোট-বড় যাই ঘটুক না কেন, এটা হয়েছে বাবা, ওটা হয়েছে বাবা; সব কথা বাবাকে বলা চাই। এ জন্য আমার নামই হয়ে গেল 'লতাবাবা'। ছেলেবেলার কত মজার ঘটনা মাঝেমধ্যেই মনে পড়ে যায়। একবার একটা মোটা সোনার বালা পরে বাইরে বেরিয়েছিলাম। মা এমন বকাবকি করলেন যে, আমি বলেছিলাম, 'আমি নদীতে ঝাঁপ দেব।' বাবা পাশ থেকে হাসতে হাসতে বলে উঠেছিলেন, 'নদীতে ঝাঁপ দিতে গেলে বালা জোড়া খুলে রেখে যেও'। রাগে আমি দু'দিন বাবার সঙ্গে কথা বলিনি। বাবা বাড়িতে থাকলে গান-বাজনা আদর-অভিমান নিয়ে জীবন একরকম হত। বাবা ট্যুরে থাকলে আমরা ভাইবোনেরা মিলে গড়ে তুলতাম নিজেদের জগৎ। ছেলেবেলা থেকেই অন্যকে অনুকরণ করার অভ্যেসটা রপ্ত হয়েছিল, অন্যদের মজাদার চালচলন, কথা বলার ভঙ্গি নকল করে মজা করতাম। এখনও মাঝে মাঝে ঘনিষ্ঠদের সামনে করে ফেলি। তবে এই নকল করার ব্যাপারটা প্লে-ব্যাক করার ক্ষেত্রেও কাজে লেগেছে। এতে গানের সুর অনুকরণ করা থেকে যাদের জন্য গান গাইছি, তাদের স্টাডি করে, গানে তাদের নেচারের সঙ্গে খানিকটা সামঞ্জস্য রেখে গাইবার চেষ্টা করা যায়। হাতের লেখা নকল করাতেও আমি বেশ পটু ছিলাম। ছেলেবেলায় একবার এ নিয়ে একটা বেআইনি কাজও করে ফেলেছিলাম। মায়ের সই করা একটা চেক, ব্যাঙ্ক থেকে ফেরত এল, সই মিলছে না। তখন মায়ের সইটা আমিই করে ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে ছিলাম। সেবার কিন্তু সইটা সঠিক মেনে ব্যাঙ্ক টাকাটা দিয়ে দিয়েছিল। তবে টাকাপয়সা নিয়ে আমার সেদিন কোনও আগ্রহ ছিল না। বাবার থিয়েটার থেকে পাওয়া টাকাকড়ি যে বাক্সটাতে পুরে বাড়িতে আনা হত, আমি সেই বাক্সের ওপর বসে পড়তাম। কিছুতেই নামতে চাইতাম না। পরে যখন টাকাকড়ি গোনা শুরু হত আমি একটা-দু'টো কয়েন তুলে নিয়ে মেঝেতে গড়িয়ে দিয়ে খেলতাম। মা খুব বকতেন, বলতেন লক্ষ্মীর ধন নিয়ে খেলাধুলো অমঙ্গল ডেকে আনে। বাবা বলতেন, 'ওই আমাদের লক্ষ্মী, ওর জন্মের পর থেকেই আমরা লক্ষ্মীর কৃপা পেয়েছি, ওকে কিছু বলো না, ও আর পাঁচজনের মতো নয়।' মাঝে মধ্যে আবার দু-একটা কয়েন চুরিও করেছি মায়ের টাকা জমানোর বাক্স থেকে। একটা কয়েন বের করে দোকান থেকে হয়তো কিনে এনেছি পিপারমেন্ট বা চকোলেট। আশ্চর্য, মা ঠিক ধরে ফেলতেন এবং এমন বকুনি দিতেন যে, চকলেটের স্বাদ তেঁতো হয়ে যেত।

আমাদের হাতে সময় খানিকটা বেশি ছিল, কারণ অন্যদের মতো স্কুল আমাদের সময় কেড়ে নেয়নি। বাবা বেশি পড়াশোনা করতে পারেননি, এজন্য বাবার আফসোস ছিল, তাই তিনি চেয়েছিলেন আমরা পড়াশোনা করি। তবে সে দিনের গড়পড়তা স্কুলের লেখাপড়ার ওপর বাবার তেমন আস্থা ছিল না। তাই তিনি আমাকে সংস্কৃত পাঠশালায় পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'সংস্কৃত শিখলে অন্য ভারতীয় ভাষা শেখা সহজ হয়ে যাবে।' এই সংস্কৃত শিক্ষা আমার সংগীত জীবনে অপরিসীম উপকারে লেগেছে। আমি গীতার স্তোত্র পর্যন্ত গাইবার আত্মবিশ্বাস পেয়েছি।

একটা পাবলিক স্কুলেও ভর্তি হয়েছিলাম আমি, তবে সে-পর্ব ছিল অতিসংক্ষিপ্ত। সাংলরি মুরলিধর স্কুলে প্রথম যেদিন যাই, ক্লাসে মাস্টারমশাই ব্ল্যাক বোর্ডে লিখতে বলেছিলেন, 'শ্রী গণেশায় নমঃ'। সংস্কৃত পাঠশালায় পড়বার ফলে এটা আমার কাছে খুবই সহজ ব্যাপার ছিল। আমি সুন্দর করে বোর্ডে লিখলাম। মাস্টারমশাই আমার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, 'খুব ভাল হয়েছে, তুমি পুরো নম্বর পেলে।' সেই আমার স্কুলে প্রথম এবং শেষ নম্বর পাওয়া। পরের দিন যখন স্কুলে যাব বলে বেরচ্ছি, আমার বোন আশা সঙ্গে যাওয়ার জন্য বায়না ধরল। ওর বিশ্রীরকম কান্না থামাতে আশাকে সঙ্গে নিয়েই স্কুলে পৌঁছলাম। সেখানে গিয়ে নতুন পরিবেশে ঘাবড়ে গিয়ে ও আবার কান্নাকাটি শুরু করলে আমি ওকে গান শোনাতে শুরু করলাম। ক্লাসের অন্য ছাত্রছাত্রীরাও দারুণ মজা পেয়ে গেল। আমি মহানন্দে গান গাইছি ক্লাসে, এমন সময় মাস্টারমশাই ঢুকে বললেন এ সব কী হচ্ছে, এটা স্কুল, ক্রেশ নয়। মাস্টারমশাইয়ের বকুনিতে আমার ভীষণ রাগ হয়ে গেল। দীননাথ মঙ্গেশকরের মেয়েকে অপমান করে যে স্কুলের মাস্টার, সেখানে একমুহূর্তও নয়। এমন ঘোষণা রেখে আশাকে কোলে নিয়ে আমি স্কুল ত্যাগ করি। আর যাইনি কোনওদিন, বাবা-মাও চাপ দেননি।" এভাবেই কাটছিল লতা মঙ্গেশকরের মেয়েবেলা, দুষ্টুমির ফাঁকে খেলতে খেলতে এভাবেই নির্মাণ ঘটছিল ভবিষ্যতের সঙ্গীত সম্রাজ্ঞীর।

উনিশশো ছত্রিশ সালে উত্তরকালের পরিক্রমায় প্রথম পা ফেললেন লতা। তখন সিনেমার ছবি কথা বলতে শিখে গিয়েছে। সিনেমা তখন নাটকের জনপ্রিয়তার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। ফলে দীননাথের নাট্যদল প্রবল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। মেয়েকে সংগীতের তালিম দিয়েছেন, তার প্রতিভার উন্মেষে খুশি হয়েছেন, কিন্তু শিশুকন্যাটি যে ভেতরে ভেতরে কতখানি আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে; নাটকের দল নিয়ে ভ্রাম্যমান পিতা তার খোঁজ রাখেননি। সাত বছরের কন্যাটি সেই ঘোষণা রেখে শুধু চমকে দিল তাই নয়, খানিকটা ত্রাতার ভূমিকাই পালন করতে হল তাকে। সেই প্রথম বহির্জগত শুনল কিন্নরকণ্ঠীর আগমনী।

৩

দীননাথ মঙ্গেশকর তাঁর নাটকের দলের সঙ্গে সপরিবার পৌঁছলেন মানমাদে। সেখানের দলের 'সুভদ্রা' নাটকের অভিনয় হবে। অভিনয়ের দিন দীননাথ দুঃসংবাদ পেলেন, নাটকে নারদের চরিত্রের যাঁর অভিনয় করার কথা, তিনি হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মাথায় হাত দীননাথের। ব্যাপারটা জানতে পেরে লতা এসে বাবাকে বললেন, 'বাবা দুশ্চিন্তা করো না, আমি নারদ চরিত্রে অভিনয়ের কাজটা চালিয়ে দেব। নারদের গান এবং সংলাপ আমার শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছে। আমি কথা দিচ্ছি দর্শকের কাছ থেকে গানের প্রশংসা আমি আদায় করে নেব। ভরসা রাখো, আমি তোমার সম্মান নষ্ট করব না।' দীননাথ ভরসা রাখলেও সমস্যা ছিল অন্যত্র। কারণ তিনি নিজে অর্জুনের চরিত্রে অভিনয় করছেন, তার বয়স ছত্রিশ আর নারদের বয়স সাত, কেমন একটা অদ্ভুত ব্যাপার

পুজোর ঘরে লতা

হবে। কিন্তু বেশি ভাবাভাবি করতে গেলে শো ক্যানসেল করতে হয়, সেটা দলের পক্ষে যেমন বদনামের তেমনই বড়রকমের আর্থিক ক্ষতি। দীননাথ মেয়ের ওপরই বাজি ধরলেন। পর্দা উঠল, প্রথম দৃশ্যেই নারদ সূত্রধরের ভূমিকায়। শিশুটির কোনও বিকার নেই, অথচ উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে উদ্বিগ্ন দীননাথ। মঞ্চের পাশে বসা হারমোনিয়ামবাদক তারযন্ত্রে সুর তুলতেই শিশুকণ্ঠে শুরু হয়ে গেল সুরের উৎসব। কণ্ঠস্বর, গাইবার ভঙ্গি, আবেগ, সবমিলিয়ে লতার গানে মোহিত দর্শক ভুলে যেতে বাধ্য হল শিল্পীর বয়স। নাটকের চরিত্রে তাকে মানাচ্ছে কি না, এ প্রশ্ন অবান্তর হয়ে গেল। সেই রাতে সংগীতের এক নতুন তারার অভিষেক হল। লতার মা বাড়ি ফিরে কন্যার কপালে কাজল লাগিয়ে দিলেন যাতে কারও নজর না লাগে।

লতার এই অসাধারণ ভূমিকায় মুগ্ধ দীননাথ মঙ্গেশকর পরের নাটকের পরিকল্পনা করলেন লতাকে মনে রেখে। 'গুরুকুল' শিরোনামের সেই নাটকে লতার ভূমিকা ছিল শ্রীকৃষ্ণের, তাঁর আর এক কন্যা মীনা সেজেছিলেন সুদামা। ততদিনে দীননাথের গৌরবসূর্য পশ্চিমে ঢলতে শুরু করেছে। আর পাঁচটা অংশীদারী কোম্পানির মতো 'বলবন্ত নাট্যমণ্ডলী'তেও দেখা দিয়েছে ফাটল। একজন প্রধান অংশীদার অভিনেতা কোলাটকর দল ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রে অনটন দেখা দেয়। যদিও আত্মবিশ্বাসী দীননাথ বলেছিলেন, 'আমি যতদিন আছি কোম্পানী থাকবে এবং চলবে'। তবে গোটা ব্যাপারটা ক্রমশ তাঁর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে লাগল। সেসময় নাট্যদলটি শোলাপুরে পৌঁছেছে একটি স্টেজ শো করার আমন্ত্রণ পেয়ে, কিন্তু শোয়ের আগের দিনগুলো কাটাবার মতো আর্থিক সাশ্রয় জোটাতে দীননাথ একটি নাট্যসংগীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। 'নূতন' প্রেক্ষাগৃহে বসেছিল এই আসর, যেখানে লতা প্রথম পাবলিক স্টেজে অবতীর্ণ হলেন। ওই আসরে ন'বছর বয়সি লতাকে প্রধান শিল্পী হিসেবে নির্বাচনে অনেকেই অখুশি হয়েছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত ওই আসরের প্রবেশপত্র নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে নাটকের চেয়েও বেশি আর্থিকপ্রাপ্তি ঘটেছিল দলের।

সেইসময়ের মারাঠি নাটকের বেশ কিছু জনপ্রিয় গান ওই আসরে গেয়েছিলেন লতা। গান গাইবার ফাঁকে দু'একবার বাবার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়েও পড়েছিলেন। সেদিনের শ্রোতারা টের পেয়েছিলেন ভবিষ্যতের এক অসাধারণ গায়িকার আগমন-সংবাদ। এই সাফল্য কন্যার সমৃদ্ধির ইঙ্গিত দিলেও পিতার পক্ষে তেমন আশ্বাস বয়ে আনল না। থিয়েটারের দর্শক ক্রমশ কমতে লাগল। সিনেমার সুদিন দেখে দীননাথ ফিল্ম কোম্পানি গড়তেও উদ্যোগী হয়েছিলেন, কিন্তু সে প্রচেষ্টাও সফল হল না। ধারদেনায় জেরবার দীননাথের ফিল্ম কোম্পানির ক্যামেরা পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হল। শেষ আশ্রয় হিসেবে সুরের কারিগর দীননাথ আঁকড়ে ধরলেন সুরাকে। অতীত গৌরবের স্মৃতি আর কন্যাকে ঘিরে সোনালি স্বপ্নের ঘোরে ক্রমশ স্বাস্থ্যের অবনতি হতে লাগল দীননাথের। এর মধ্যেই মেয়েকে শেখাচ্ছেন গান। গনেশ উৎসবে লতার গাওয়া গান শুনে মুগ্ধ দর্শকদের মাঝখানে গর্বিত পিতা দীননাথ স্বগতোক্তির মতো বলেন, 'আমি চলে গেলে, পরিবারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার আর ভাবনা রইল না।' রেডিও স্টেশনে গাওয়া লতার প্রথম অনুষ্ঠান শুনে দীননাথ বলেছিলেন, 'মনে হচ্ছে আমি নিজেরই গান শুনছি।' রাজসিক চালচলনে অভ্যস্ত দীননাথকে অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য পুনেতে একটি দু'কামরার ঘরে উঠে আসতে হয়েছিল। সেখানে ধীরে ধীরে অসুস্থ হয়ে পড়লেও দীননাথ মাঝেমধ্যেই সারেঙ্গি নিয়ে বসতেন, লতা-আশা-মীনা তিন কন্যাকেই তালিম দিতেন। দৈন্য ভুলতে নিজেও গানে ডুবে যেতেন। যেদিন নাটকের

লতার চুল বেঁধে দিচ্ছেন আশা

দলের কর্মচারীরা বাড়িতে টাকার জন্য হামলা করে ঘরের জিনিসপত্তর যে যা পারে তুলে নিয়ে যাচ্ছে, সেদিনও দীননাথ কোনও দিকে না তাকিয়ে গানের মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজেছেন।

ইতিমধ্যে লতা প্রতিযোগিতায় সামিল হয়ে গিয়েছেন। উনিশশো একচল্লিশ সালে মুক্তি পেয়েছিল লাহোরের বিখ্যাত ফিল্ম কোম্পানি পাঞ্চোলি আর্টসের 'খাজাঞ্চি'। বাণিজ্যিক হিন্দি ছবির এডিটিং, সাউন্ড-মিক্সিং এবং হিন্দি-উর্দু ফিল্মি সংগীতের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ সিনেমা 'খাজাঞ্চি'-র গায়ে লেগেছিল মেগা হিট লেবেল। সেই সিনেমার সংগীত পরিচালক ছিলেন গোলাম হায়দার। গানবহুল এই ছবির রজতজয়ন্তী কেন্দ্র করে একটি সংগীত প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল ছবির নির্মাতারা। একইসঙ্গে ছবির প্রচার এবং প্রতিভা সন্ধান—এই যৌথ উদ্দেশ্য সাধনের উদ্যোগ বেশ সাড়া জাগিয়েছিল। দেশের নানা শহরে হয়েছিল এই প্রতিযোগিতা। কোলাপুরের কম্পিটিশনে নাম দিয়েছিলেন লতা। দীননাথের তেমন সম্মতি না থাকলেও বাধা দেননি মেয়েকে। ঘটনাচক্রে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম পুরস্কার জিতেছিলেন লতা মঙ্গেশকর। বারো বছরের কিশোরী লতা ওই প্রতিযোগিতার অন্যতম বিচারক গোলাম হায়দরের হাত থেকে পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিলেন দু'টি সোনার মেডেল এবং একটি বাদ্যযন্ত্র 'দিলরুবা'। পুরস্কার প্রাপ্তির উৎসব সেই যে বারো বছর বয়সেই শুরু হয়েছিল, আজও তা অব্যাহত। তবে প্রথম সাফল্যের স্মারক হিসেবে লতার অতি প্রিয় ওই দিলরুবাটি নিয়ে বাবা-মেয়ের মধ্যে একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

তখন দীননাথের শরীর যথেষ্ট ভেঙে পড়েছে, মানসিক অবসাদ বেড়ে চলেছে, ক্রমশ। গানবাজনা আঁকড়ে ধরে মাঝেমধ্যে এ থেকে কিঞ্চিৎ অব্যাহতির পথ খোঁজেন তিনি। একদিন লতার গর্বের দিলরুবাটি নিয়ে তিনি সুর তুলছিলেন ছড়ের টানে। ঘরের ভেতর দৌড়োদৌড়ি করছিল একটি ইঁদুর। হঠাৎই রাগ বা বিরক্তি থেকে হাতের ছড়টি দীননাথ ছুড়ে মারলেন ইঁদুরটির দিকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, ইঁদুর পালাল, কিন্তু ভেঙে গেল দিলরুবায় সুর তোলার ছড়টি। নিজের অর্জিত সাধের পুরস্কারটির এই হাল দেখে স্বভাবতই লতার রাগ হল বাবার ওপর, কান্নায় ভেঙে পড়ল লতা। মেয়েকে সান্ত্বনা দিয়ে বাবা সেদিন বলেছিলেন, 'তোমার অর্জন করা পুরস্কার নিশ্চয়ই মূল্যবান, কিন্তু তোমার এই রাগ বা কান্নার পেছনে রয়েছে পুরস্কার নিয়ে এক ধরনের অহঙ্কার। এটা ত্যাগ করো। পুরস্কার বা সম্মান জীবনে অনেক পাবে, কিন্তু তাকে নিয়ে বেশি মাথা ঘামানোটা ঠিক নয়। নাম-যশ-সম্মান নিয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া হলে এগুলোর সঙ্গেই ক্রমশ জড়িয়ে যাবে, এগোবার পথরোধ করবে এ সব বাধা'। লতা এই উপদেশ মনে রেখেছেন। পুরস্কার প্রাপ্তি নিয়ে তাঁর আচরণে অন্তত তেমন উচ্ছ্বাস গোচরে আসে না। প্রাপ্তির শিখরে বসেও লতার পোশাক সেই কিশোরী বয়সের মতোই। সাদা শাড়ি, মুখে স্মিত হাসি, রুচিশীল, মার্জিত ব্যক্তিত্ব। সিনেমার মতো শো বিজনেসের সঙ্গে পাকে পাকে জাড়িয়ে থেকেও গ্ল্যামার দুনিয়ার প্রভাবমুক্ত লতা।

সিনেমার সঙ্গে দীর্ঘ ছ'দশক জুড়ে যে এমন অবিচ্ছেদ্য গাঁটছড়া বাঁধা হবে, তেমন অনুমান লতার ছিল না, দীননাথও চাইতেন না সিনেমার সঙ্গে মেয়েদের ঘনিষ্ঠতা হোক। তাঁর সাম্রাজ্যের পতন না ঘটলে লতা রাগসংগীত এবং নাট্যসংগীতের শিল্পী হিসেবেও শিরোনাম হতে পারতেন। রেডিওতে লতার প্রথম প্রোগ্রাম ছিল রাগসংগীতের। ন'বছর বয়সে শোলাপুরে একটি সংগীত সম্মেলনে 'খাম্বাবতী' রাগ গেয়েছিলেন লতা। শ্রোতাদের তারিফও জুটেছিল। লতার গাওয়া অধিকাংশ নাট্যসংগীতেরই ভিত্তি ছিল রাগসংগীত, ফলে ওই খাতে জীবন বইলে তাঁর পক্ষে অন্য ধারার গানের শিল্পী

হিসেবে পরিচিত হওয়াটাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু গান লতাকে গাইতেই হত। বাবার মৃত্যুর একমাস আগে লতা গেয়েছিলেন সিনেমায় তাঁর প্রথম গান। "তখন আমার বয়স সবে বারো পেরিয়েছে। সিনেমার প্রথম গান গাওয়া বলেই সময়টা মনে আছে। উনিশশো বিয়াল্লিশের গোড়ার দিকে ঘটেছিল সেই সংযোগ। বসন্ত যোগলেকরের মারাঠি ছবি 'কিতি হাসাল' (কত হাসতে পারো) সিনেমায় আমাকে প্রথম গান গাইবার সুযোগ দিয়েছিল। বাবার ভীষণ আপত্তি ছিল, তবে বাবার একজন সহকারী সদাশিব রাও, অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত বাবাকে রাজি করিয়েছিলেন। বাবা সদাশিব রাওকে সম্মতি দিয়েছিলেন একটি শর্তে 'এই প্রথম এবং এই শেষ, আর কখনও এরকম অনুরোধ করবেন না।' সেই প্রথম আমার স্টুডিও'তে পা রাখা। সদাশিব রাও আমার গলার উপযোগী সুর করে দিয়েছিলেন 'নাচু ইয়া গড়ে খেলু সারি মনী হৌস ভরি' গানটিতে। আমি গেয়েদিলাম ব্যস, এর চেয়ে বেশি কোনও ইনভলভমেন্ট আমার ছিল না।" কিন্তু 'মর্নিং শোজ দি ডে' প্রবাদটা লতা মঙ্গেশকরের সিনেমার গানের ক্ষেত্রে মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। ব্যর্থতা দিয়েই শুরু হয়েছিল সিনেমার জন্য লতার কণ্ঠদান। কারণ ওই গানটা রেকর্ড করা হলেও শেষ পর্যন্ত ছবি থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়।

মৃত্যুর কয়েকদিন আগে অসুস্থ দীননাথ স্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন 'ব্যাঙ্কে আর কত টাকা আছে?' 'চার পাঁচ টাকা হতে পারে' বিষণ্ণ মা উত্তর দিয়েছিলেন। 'আমারও জীবনের অ্যাকাউন্টও বন্ধ হওয়ার সময় এসে গিয়েছে' স্বগতোক্তি করে, লতাকে কাছে ডেকেছিলেন দীননাথ। সেদিনের কথা লতার হৃদয়ে গেঁথে আছে। বাবা বলেছিলেন, 'আমি জীবনে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করেছি কিন্তু তার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। সময়ের সঙ্গে লড়াইয়ে আমি হেরে গিয়েছি—তোমাদের কাছে আমি অপরাধী। ঘরের কোণায় ওই তানপুরা আর দেরাজে গানের খাতাগুলো ছাড়া আর কিছুই রেখে যেতে পারলাম না। তবু আমি নিশ্চিন্ত যে তুমি একদিন আমার চেয়ে বড় শিল্পীর প্রতিষ্ঠা পাবে। দেবতা মঙ্গেশ তোমাকে রক্ষা করবেন।' আরও অনেক কথাই বলার ছিল, শেখানোর ছিল অনেক গান। কন্যার কিঞ্চিৎ সাফল্যের পরিতৃপ্তিও তিনি পাওয়ার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু দীননাথের সময় শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন বমির সঙ্গে উঠে এল তাজা রক্ত। তড়িঘড়ি তাকে সাসুন হাসপাতালে ভর্তি করা হল। একমাত্র মা ছাড়া আর কেউই বিপদটা ঠিক আঁচ করতে পারেননি। সবাই ভেবেছিলেন ধাক্কাটা সামলে নেবেন দীননাথ। ফলে মৃত্যুশিয়রে প্রিয়তমা কন্যা লতাও উপস্থিত ছিলেন না। লতা যখন হাসপাতালে গিয়ে পৌঁছলেন তখন দীননাথের নিষ্প্রাণ দেহের পাশে বিহ্বল স্ত্রী।

চব্বিশে এপ্রিল উনিশশো বিয়াল্লিশ দীননাথ গনেশ মঙ্গেশকর 'অতীত' হয়ে গেলেন। লতা মঙ্গেশকর হারালেন তাঁর প্রধান গুরু এবং আদর্শ ব্যক্তিত্বকে। তখন বিশ্বযুদ্ধের সময়। পুনে শহরে তখন সন্ধ্যের পর চলত ব্ল্যাক আউট, কারফিউ। ফলে সন্ধ্যের আগে মৃতদেহ সৎকার করে ফেলতে হবে। কিন্তু হাসপাতাল থেকে

শ্মশানে যাওয়ার জন্য গাড়ি জুটছে না, মৃতদেহ বহনের জন্য ট্যাক্সিকে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়ার সামর্থ্যও নেই। শেষ পর্যন্ত একজন ড্রাইভার জুটল যে মঞ্চের দীননাথকে চিনতে পেরে, তাঁর মৃতদেহ শ্মশানে পৌঁছে দিতে রাজি হল। নাটকের মঞ্চে একদিন যাঁর হাজার মানুষের করতালি পাওয়া নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর সৎকারে পরিবারে লোকজন-সহ মাত্র ছ'জন শ্মশানবন্ধু উপস্থিত ছিল। ক'দিন বাদে পুনের এক দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন পণ্ডিত শোকাচ্ছন্ন পরিবারকে বচন দিলেন—'অশুভ লগ্নে দীননাথের মৃত্যু হয়েছে, তাই যথাবিহি পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন না করলে তাঁর অশুভ আত্মা পরিবারের ক্ষতির কারণ হবে।' অজানা আশঙ্কায় ধার-দেনা করে পারলৌকিক ক্রিয়াকর্ম করা হল। শেষে পুরোহিত দীননাথের মুক্ত আত্মাকে একটি আস্ত নারকেলের ভেতর পুরে দিয়ে বললেন, এই নারকেল যতদিন বাড়িতে থাকবে ততদিন এ বাড়ির সমৃদ্ধি হবে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত লতার পুজোর ঘরে নারকেলের জন্য নির্ধারিত হয়েছে স্থায়ী আসন। আজও নারকেল ভক্তিভরে পূজিত হয়। দীননাথের পারলৌকিক ক্রিয়ায় পঁচাত্তর টাকা খরচা করার পর বাড়িতে অবশিষ্ট ছিল শুধুমাত্র চারদিনের রেশন। বাড়ির ছ'জন সদস্যের পঞ্চম দিনের কী খাদ্য হবে সেটি হয়ে উঠল প্রধান ভাবনা। রাতারাতি তেরো বছরের কিশোরী লতার বয়েস এক লাফে বেড়ে গেল অনেকখানি। 'ছেলেবেলা' উধাও হয়ে জন্ম নিল এক পরিণত 'দিদি'। তখনকার মতো গানবাজনার পাট চুকে গেল। লতা পরিচিতদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন, যদি কোনওরকম কাজ পাওয়া যায়, যাতে ছ'জনের দু'বেলা দু'মুঠো আহার্যের সংস্থান সম্ভব। এইসময় ঈশ্বরের আশীর্বাদ হয়ে এলেন দীননাথের একদা সহযোগী শ্রীপদ যোশী। তিনি একটি চিত্রনির্মাতা সংস্থায় লতাকে শিশুশিল্পীর কাজ জুটিয়ে দিলেন।

সেদিনের সংগ্রামী জীবনের অভিজ্ঞতা আজ সাফল্যের চূড়ায় বসে সহজভাবেই বলেন লতা—"সেদিন ষাট টাকা মাস মাইনের ওই চাকরিটা না পেলে কী যে হত ভাবাই যায় না। আসলে তখন ভাবনাচিন্তার কোনও সুযোগই ছিল না। যা পেয়েছি তাই আঁকড়ে ধরেছি। বাবা যা ভীষণভাবে অপছন্দ করতেন, বাবার হঠাৎ মৃত্যু আমাকে সেই সিনেমারই স্মরণ নিতে বাধ্য করেছিল। আসলে হয়তো এমনই ঈশ্বরের ইচ্ছে ছিল। যে ফিল্ম কোম্পানীতে কাজ পেলাম তার একজন অংশীদার ছিলেন মাস্টার বিনায়ক। উনি বিখ্যাত অভিনেত্রী নন্দার বাবা। নন্দা ছেলেবেলায় বেবি নন্দা নামে অভিনয় করেছে, ওর ভাইও বাবার ছবিতে অভিনয় করেছে। আমি গান গাইতে পারতাম বলে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ের সঙ্গে আমাকে গানও গাইতে হল, যদিও সেজন্য আলাদা কোনও পারিশ্রমিক পেলাম না। ওদের ব্যানারে আমার প্রথম ছবি 'পহলি মঙ্গলাগৌড়'। ওই মারাঠি ছবিতে আমি দাদা চান্দেকরের সুরে একটি গানও গেয়েছিলাম—'নাতালি চৈত্রায়ী নাবলায়ী'। এরপর বাড়িতে আবার শুরু হল গানবাজনা। ভাইবোনদের গানবাজনার নিয়মিত চর্চার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন মা। সারাদিন কাজে ব্যস্ত থাকতাম বলে আমার রেওয়াজের সময় ছিল খুব ভোরে আর সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে। কয়েক মাস এভাবে চলবার পর মাস্টার বিনায়ক পুনের ওই কোম্পানী ছেড়ে কোলাপুরে গিয়ে নিজেই ফিল্ম কোম্পানী তৈরি করলেন, প্রফুল্ল পিকচার্স। কিন্তু আমার সঙ্গে আগের কোম্পানীর চুক্তি ছিল বলে তখনই অন্য কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। 'চিমুকলা সন্সার' ছবির কাজ চলছিল তখন। সেটা শেষ করে আমি যোগ দিলাম বিনায়কের কোম্পানীতে। উনিশশো তেতাল্লিশের ইংরেজি নববর্ষের দিন আমরা সপরিবারে পৌঁছলাম কোলাপুরে। নতুন কোম্পানীতে আমার মাইনে হল মাসে আশি টাকা। তবে এদের কাজ শুরু হওয়ার আগে মাস্টার বিনায়ক শালিনী সিনেটোন নামে একটি সংস্থার ছবিতে নির্দেশনার ডাক পান। মারাঠি ঔপন্যাসিক ভি এস নান্দেকরের লেখা কাহিনি নিয়ে তৈরি ছবিটির নাম 'মাঝা বাল' (আমার শিশু)। বিনায়কজির সুপারিশে ওই ছবিতে আমি একটি অনাথ বালিকার চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পেলাম। অনাথ আশ্রমের ছেলেমেয়েরা গান গেয়ে জনতার সহানুভূতি জাগিয়ে অর্থ সংগ্রহ করছে এমন একটি দৃশ্য ছিল ওই ছবিতে। তো অনাথ শিশু সাজবার জন্য বেশ কিছু ছেলেমেয়ে দরকার ছিল। আমি বাড়ি থেকে আশা আর মীনাকে সঙ্গে নিয়ে স্টুডিওতে গেলাম। সবাই মিলে গান গেয়ে সাহায্য চাইবার দৃশ্যে অভিনয় করলাম। পরিচালককে আমাদের পেছনে তেমন পরিশ্রম করতে হয়নি, কেননা আমাদের তখন প্রায় অনাথ অবস্থা, ফলে স্বাভাবিকভাবে যা করেছিলাম সেটাই মানিয়ে গিয়েছিল। বিয়াল্লিশ সালে প্রথম সিনেমার গান গাইলেও, প্রথম হিন্দি গান গেয়েছিলাম পরের বছর প্রফুল্ল পিকচার্সের 'গজভাউ' ছবিতে। ছবি মারাঠি ভাষায় হলেও গানটি ছিল হিন্দি ভাষায়। বিখ্যাত মারাঠি কৌতুকাভিনেতা দামুয়ন্না মালবঙ্কর ওই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। অভিনয়ের সঙ্গে আমরা গাওয়া সেই দেশাত্মবোধক গানটি ছিল—'মাতা এক সপুত কি দুনিয়া বদল দে তু'।

কোলাপুরে বিনায়ক রাও একটি বড়সড় বাংলো নিয়েছিলেন। আমরা থাকতাম টিনের ছাদওয়ালা সাড়ে পাঁচ টাকা ভাড়ার একটা সাধারণ বাড়িতে। মা মাঝেমধ্যে খালনাতে বাপের বাড়ি গেলে আমি তার মীনা বিনায়কজির ওই বাংলোতেই থেকে যেতাম। এইসময় বিনায়ক রাও একটি বড়মাপের ছবির কাজ শুরু করেছিলেন 'বড়ি মা'। ছবির নায়িকা ছিলেন সেদিনের বিখ্যাত তারকা নূরজাহান, সঙ্গে ঈশ্বরলাল, সিতারা, ইয়াকুব, লীলা মিশ্র এবং 'বেবি লতা'। ওই ছবির সেটে শুটিংয়ের ফাঁকে 'মালিকা-এ-তরন্নুম' নূরজাহানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। উনি আমার গান শুনতে চেয়েছিলেন, ওঁর গানের সঙ্গে গাইতেও বলেছিলেন। পরে বিনায়কজিকে উনি বলেছিলেন—'লেগে থাকলে মেয়েটি খুবই উন্নতি করবে।' আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'চর্চা করে যাও একদিন ফল পাবে, প্রচুর নাম ডাক হবে।'

এই 'বড়ি মা' ছবির শুটিং করার জন্যই বিনায়ক রাও সদলবলে বোম্বাই গিয়েছিলেন, সেই সূত্রে উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে আমিও পৌঁছলাম আরব সাগরের তীরে স্বপ্নশহরে, যেখানে ঈশ্বর আমার ভবিষ্যতের বন্দর ঠিক করে রেখেছিলেন।"

ছবি সৌজন্য: অতনু চক্রবর্তী

শোলাপুরে লতার জীবনের প্রথম স্টেজ পারফরম্যান্স

'পহেলি মঙ্গলাগৌড়' সিনেমায় মাস্টার বিনায়কের সঙ্গে

# অন্য ভূমিকায়

**লতা যখন অভিনেত্রী**

| ছবির নাম | বছর |
|---|---|
| পহিলি মঙ্গলাগৌড় | ১৯৪২ |
| মাঝা বাল | ১৯৪৩ |
| চিমুকলি সন্সার | ১৯৪৩ |
| বড়ি মা | ১৯৪৫ |
| সুভদ্রা | ১৯৪৬ |
| মন্দির | ১৯৪৮ |
| ছত্রপতি শিবাজি | ১৯৫২ |
| পুকার | ২০০০ |

(শেষ দু'টি সিনেমায় একটি গানের দৃশ্যে)

**লতা যখন সংগীত পরিচালক**

| | |
|---|---|
| রাম রাম পহুনে | ১৯৫০ |
| মহিত্যাঞ্চি মঞ্জুলো | ১৯৬২ |
| মারাঠা তিতুকা মেলভাডা | ১৯৬৪ |
| সাধি মানসে | ১৯৬৫ |
| তামাব্দি মাটি | ১৯৬৯ |

(সব ক'টিই মারাঠি ছবি
প্রথমটি স্বনামে বাকি 'আনন্দঘন' ছদ্মনামে)

**লতা যখন প্রযোজক**

| | |
|---|---|
| বাদল (মারাঠি) | ১৯৫৩ |
| ঝাঁঝর (হিন্দি) | ১৯৫৩ |
| কাঞ্চন (হিন্দি) | ১৯৫৫ |
| লেকিন (হিন্দি) | ১৯৯০ |

(সি রামচন্দ্রর সঙ্গে যৌথভাবে)

# পথের পাঁচালি

কাশফুল নীল আকাশ সহজ জীবন গ্রাম শহরের কোনও কাজে লাগে না। এসব থেকে টাকা আসে না। যখন ভূদৃশ্য বেচা যাবে, গ্রামজীবন বাণিজ্যবস্তু হবে, ধানখেতের নিসর্গদৃশ্যে কিংবা মাঠের ওপর শুকনো পাতা উড়িয়ে যাওয়া বাতাস বর্গফুট হিসাবে নীলাম হবে তখন হয়তো—তার আগে পর্যন্ত শহর জানবে অন্ন বস্ত্র পানীয় সব পাওয়া যায় শপিং মলে।

জয়া মিত্র

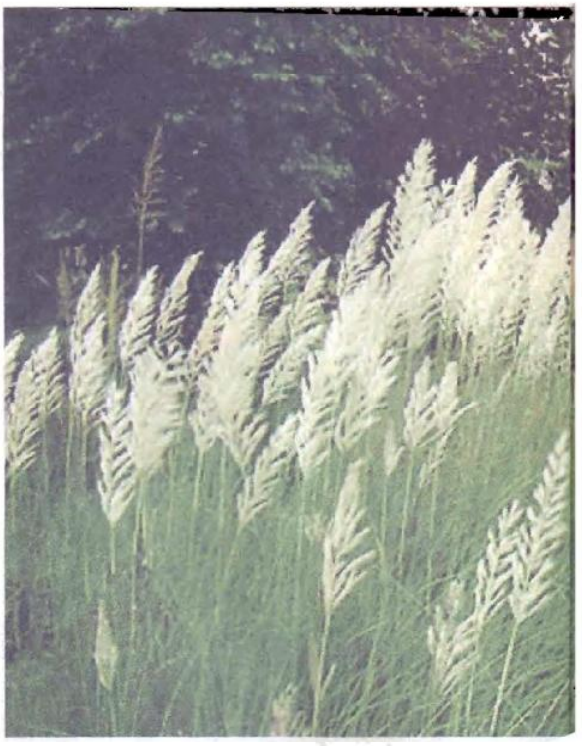



**কলকাতা থেকে সে ফিরছিল আসানসোল।** চারিপাশে প্রগাঢ় শরৎ। রাস্তার দু'পাশে ঘন সবুজ ধানখেতে ঢেউ দিয়ে যাচ্ছে হাওয়া। নদীর ধারের অবস্থা যাই হোক, বৃষ্টিতে এ বছর ধানের অবস্থা ভাল। খাল পুকুর—যতটুকু চোখে পড়ছে, জলে টইটম্বুর, তারই মধ্যে আকাশের ছায়া আঁকা। বাসের জানলা জোড়া চোখ জুড়ানো, মন ভোলানো 'এস-হে শরতের অমলমহিমা!' কিন্তু তবু কী যেন ভিতরে ভিতরে কাঁটা ফোটে। মুখ নেই কো মনে। জানলার বাইরের সবুজ কোমল আস্তরণ ভেঙে কর্কশ দেওয়াল। দেওয়ালের ভিতর পড়ে থাকা ফ্যাকাশে জমি। অজস্র ফসল ফলাতে সক্ষম মাটি নিরুপায়ে পড়ে আছে বন্দি দশায়। ২০০৬ সালে তারা কয়েকজন বন্ধু ওখানে গিয়েছিল। ২০০৭-এর ১৫ অগাস্ট প্রতিবেশিরা দোবাদি গ্রামে। পুরোপুরি খেতমজুরদের গ্রাম, কারও একটুও জমি তখনও ছিল না, তার আগেও ছিল না। কিন্তু আট-দশ-বারো জনের পরিবারে ছ-সাতজন মানে বাচ্চা আর বুড়োবুড়ি বাদে প্রায় সবাই, মজুরি কাজ করতেন সারা বছর। এত ফলন হত। ধান, পাট, আলু। তার ফাঁকে ফাঁকে সবজি—ঝিঙে পটল উচ্ছে কুমড়ো বরবটি শশা কী নয়। খাবারের অভাব আমাদের কখনও হয়নি, বলেছিলেন দোবাঁদির এক মা যাঁর ছয় ছেলে পাঁচ বউ, তিনি নিজে, সবাই কাজ করতেন। সংসারের খাওয়া খরচ কম হওয়ার দরুণ মজুরির টাকা থেকে তাঁর সংসারের সাধারণ পোশাক-আশাক ছোটদের পড়াশোনার খরচও কুলিয়ে যেত। বলেছিলেন আলুর সময়ে মাঠ থেকে এক দেড় বস্তা আলু আমরা অমনিই পেতাম। ভিণ্ডি ঝিঙে উচ্ছে বরবটি নিজেদের খাবার মতো তুলে আনায় কোনওদিন কোনও বাধা হয়নি। সেই সমস্ত ধান সবজিতে ভরা জমি এতদিনে চলে গিয়েছে নতুন উন্নয়ন স্বপ্নের পাঁচিলের ভেতরে। তবু সেই মা আমাদের বলেছিলেন গাঁয়ে ঘুরেফিরে সময়ে যেন তাঁর ঘরে ভাত খেয়ে যাই। তেতপ্পর বেলায় খালি মুখে গৃহস্থ ঘর থেকে যেতে নেই।

তার মনে পড়ে নিজের ঠাকুমাকে। খুব সাধারণ গৃহস্থালির যে গৃহিণী নিজের পনেরো ষোলো জনের পরিবারেও এই নিয়মটি প্রচলিত রেখেছে। দুপুরে বাড়িতে আসা কোনও অতিথি না খেয়ে যাবে না। সংসারে 'ডালভাত ঝোলভাত যা রান্না হবে, খেয়ে যাবে।' তাঁর বালিকাবেলা কেটেছিল গ্রামে, শ্বশুরবাড়ি মায়ের বাড়ি—দুই-ই। গ্রামে স্বাভাবিক অবস্থায় খাবার কত জিনিস যে না কিনেও খোলা মাঠে পুকুরে জলাজমিতে অমনিই পাওয়া যায় তার চমৎকার ছবি পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালি আরণ্যক ইছামতীতে মাটির আপন হাতের দান সেইসব জিনিসকে শহর তার স্বভাবকৃপণতায় চিহ্নিত করে রেখেছে 'গরিব লোকের খাবার' বলে। মাঠ থেকে তুলে আনা ঢেঁকিশাক, নটেশাক আদরের হয় কেবল যখন কারও হাত ঘুরে পঞ্চাশ টাকা কিলো দরে বাজারে বিকোতে আসে। খোলা জানলার বাতাসের চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদা যেমন এসি-র স্বাস্থ্যহানিকর ঠান্ডা আরামে।

২০০৪ সালে সার্ক দেশগুলির এক লেখক সম্মেলনে পরিচয় হয়েছিল শ্রীলঙ্কার এক প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে। কলম্বো শহরে তাঁর বাড়ি। মানে ফ্ল্যাটে। গ্রাম্যজীবনের অন্ধকারাচ্ছন্ন দুর্দশা থেকে নাগরিক সভ্যতার ঝকঝকে

উন্নতিতে। প্রসঙ্গত বলেছিলেন অবশ্য শহরজীবনে মূল্যবৃদ্ধির সঙ্কটের কথাও। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে নিজেদের ছোটবেলার নানা স্মৃতির কথা আসে। অধ্যাপক বলেন গ্রামের ছেলে তিনি, খুব গরিব পরিবার থেকে বহু কষ্টে নিজের পড়াশোনা শেষ করেছেন। কথায় কথায় শোনা যায় গ্রামের সৌন্দর্য আর বাল্যকালের দুষ্টুমির বিচরণও, ছোট জলধারা পার হয়ে কেমনভাবে পড়তে যেতেন বন্ধুরা মিলে। দু'পকেট ভর্তি পেয়ারা আর গোলাপজাম। গোলাপজামের সিংহলি নামটি শুনে কেউ জানতে চান সেটা কী। এটা একটা সুন্দর গন্ধওলা ফল। খুবই দামি ফল। বলেন শ্রীলঙ্কা অন্য প্রতিনিধি, এক তরুণী লেখিকা।

'তবে যে আপনি বললেন খুব গরিব ছিল আপনার পরিবার, তো ওই অত দামি ফল পকেট ভর্তি করে নিয়ে যেতেন রোজ!' এবার একটু অপ্রস্তুত অধ্যাপক 'না, মানে গ্রামে তো ফলপাকুড় আপনি আপনিই অনেক পাবেন। সবারই বাড়িতে গাছ থাকে, দু-দশটা ছিঁড়ে নিলে কেউ কিছু মনে করে না। বরং পাড়া প্রতিবেশীকে দেয় লোকে। নিজেরা আর কত খাবে!' তারপর গল্প করতে থাকেন এম এ পড়তে যখন কলম্বোয় এসেছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষকের বাড়ি গিয়ে কীরকম অবাক হয়েছিলেন তাঁদের ফেরিওয়ালার কাছে ছ'টা কলা কিনতে দেখে। কলা যে গুনে গুনে কেনা হয় এ আমি তার আগে কখনও কল্পনাও করতে পারিনি, জানেন!'

এইসব এলোমেলো ভাবনার মধ্যে দিয়ে পেরিয়ে যায় সিঙ্গুরের পাঁচিল, দিন পনেরো আগে যেখানে দেখেছিল শুধু নুন দিয়ে ফেনাভাত মেখে খেতে সেই দোবাঁদির মানুষদের। পরিবার থেকে দু-তিনজন খাটতে যান, যে কাজ তারা আগে জানতেন না সেই মাটি কাটা মাটি বওয়ার কাজ করতে। যা পয়সা পান তাতে চাল ছাড়া আর শুধু নুন, জ্বালানিটুকুই কেনা যায়। বাকি সমস্তটাই কাদামাটি। তা থেকে হয়তো খুব সুন্দর সুন্দর মোটরগাড়ি হবে কিন্তু মোটরগাড়ি দিয়ে পেট ভরাতে শেখেননি বাজেমেলিয়ার বেড়াবেড়ির চাষিরা। হয়তো অনেক উন্নতি হবে সিঙ্গুরের। মাঠ ভরে যাবে সিমেন্ট রড কংক্রিটে। এলাকা ভরে যাবে বাইরের লোকে। সিঙ্গুরের আশপাশে জমির দাম এখনই আকাশছোঁয়া। ধানজমিতে তৈরি হবে ফ্ল্যাটবাড়ি। কত লোক খাটবে সেখানে। পানের দোকান চায়ের দোকান। দারোয়ান, বাড়িতে বাড়িতে ঠিকে ঝি। বছরে আড়াই লক্ষ গাড়ি বেরোবে তাতে অন্তত দু'লক্ষ ড্রাইভারের চাকরি। লোকে শুনেছে কারখানা একবার চালু হলে দৈনিক দু'হাজার করে ট্রাক আসবে। বদলি ডিউটি ধরে তিন হাজার ড্রাইভার। কত কী দরকার হবে তখন। ধাবা বেশ্যাবাড়ি ছোকরা। কাজের কোনও অভাব থাকবে না সিঙ্গুর আর তার আশপাশের লোকেদের। হাতে হাতে নগদ টাকা। সে টাকায় সব সুখ কেনা যাবে। মানে গাঁয়ের লোকেরা যত সুখ ভাবতে পারে। এ শরৎ পরের শরৎ তার পরের....

কাশফুল নীল আকাশ সহজ জীবন গ্রাম শহরের কোনও কাজে লাগে না। এসব থেকে টাকা আসে না। যখন ভূদৃশ্য বেচা যাবে, গ্রামজীবন বাণিজ্যবস্তু হবে, ধানখেতের নিসর্গদৃশ্যে কিংবা মাঠের ওপর শুকনো পাতা উড়িয়ে যাওয়া বাতাস বর্গফুট হিসাবে নীলাম হবে তখন হয়তো—তার আগে পর্যন্ত শহর জানবে অন্ন বস্ত্র পানীয় সব পাওয়া যায় শপিং মলে। ফেলো কড়ি মাখো তেল, তিনটে জিনিসের প্যাক কিনলে এক কেজি সর্ষের তেল ফ্রি।

# আয় মন বেড়াতে যাবি

## সুব্রত মুখোপাধ্যায়

ষাট

**নিদারুণ বৃষ্টি আর ঝঞ্ঝাস্রোত দুটি নরনারীর উন্মত্ত সম্মীলন রোধ করতে পারেনি।** আসলে দীর্ঘকাল রামপ্রসাদ প্রায়ই দূরে থেকেছেন দেশকালের হয়রানকারী ভাবনায়। এ ভাবনা প্রত্যক্ষের চেয়ে পরোক্ষই। তবু তো তার মধ্যে নির্লিপ্তির অনুপ্রবেশ নেই। কবির চিত্ত সদাই তার নিজের স্বভাবে সময় দেখে। সময়ের বিচিত্র আন্দোলনের সঙ্গে সে দুলে ওঠে। প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কিঞ্চিৎ খালাস হয়।

ভুঁয়ে পড়া দু'টি কাদা-জল মাখামাখি শরীর যখন উঠে দাঁড়ায় তখনও বাজ-বৃষ্টির একই ধারা। একই রীতিতে গাছগুলি আন্দোলন করে চলেছে। শরীর দিয়ে শরীর গ্রহণ, এই প্রকৃতি সজাগ হয়ে প্রত্যক্ষ করেছে। একজোড়া মানবশরীরের উন্মত্ত বিহার এক পার্থিব আর ঘুরপথি সমরের চলচ্ছবি সৃষ্টি করেছে। কোথায় যেন অলখে ভিন্ন এক সমরের রূপ পরিগ্রহ করে বসে আছে।

হাঁড়া থেকে প্রসাদ বাকি পানীয়টুকু গলায় উবুড় দেন। সর্বাণী এই প্রথম বুঝি শিথিল লজ্জার স্বভাব টের পায়। পরনের ভিজে কাপড়খানিময় কাদার অলঙ্কার হয়তো শরীরের লজ্জাস্থানগুলি আড়াল দিতে সাহায্য করে। সে চোখ না তুলে তার পুরুষটির প্রতি বলে, ডাকাত। ডাকাত।

পুরুষ এ গুণপনা বর্ণনে বিশেষ বিচলিত হন না। বরং পানোন্মাদনায় হা হা হেসে ওঠেন। সে-হাস্যে আকাশচারী বাজবিদ্যুৎ কুতুহলি দোহার দেয়। বৃষ্টিস্রোতে মাটি বরাবর সাময়িক জল বিস্ফোরণ ঘটে। তার মধ্যে সাঁতার দেয় অগুণতি কই, মাগুর আর শিঙি মাছ। মাছেরা যায় আর আড়ে আড়ে বলে, ও হে রামপেসাদ, তোমরা দু'টিতে যেমন এই বাদলে ঘর ছেড়ে ভুঁয়ে নেমেছ, তেমনি আমরাও জল ছেড়ে ডাঙায় উঠেছি। তোমরা যেমন এই আকাশতলের সুখ আন্দোলন উপভোগ করছ, আমরাও বা কম কীসে। আমরাও দল বেঁধে নেমে পড়েছি সুখ লুণ্ঠন করতে।

প্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন, এ বেশ ভাল হল বউ। এতকাল লড়াই-যুদ্ধ হত ছাদ আঁটা ঘরে। এখন নেমে এল একেবারে খাস মাটির পরে। আর কোনও আগল রইল না।

সর্বাণী আবার বলে, ডাকাত। ডাকাত।

প্রসাদ, ডাকাতি তো ঘরে হয় বলেই জানা আছে গো।

সর্বাণী, কেন বনে হয় না বুঝি। বরং বনের মধ্যেই তো ডাকাতি জবর হয় কেড়েকুড়ে সব্বস্ব হরণ করে নেয় ডাকাতরা।

প্রসাদ, তা বটে তা বটে। তবে ডাকাতির তত্ত্ব ঘরে সিধেসাধা। আর বাইরে বিস্তর জটিল।

সর্বাণী, তা বটে। ডাকাতদের দলপতি বলেই এমন সিধে করে আমায় সমঝিয়ে দিলে।

প্রসাদ, তা হলে আমার মতো করে আর একটু সমঝাই।

সর্বাণী শুধু প্রশ্ন আঁকা চোখ দু'খানি তুলে ধরে।

প্রসাদ গেয়ে ওঠেন,

বাসনাতে দাও আগুন জ্বেলে
ক্ষার হবে তার পরিপাটি
কর মনকে ধোলাই, আপদ বালাই
মনের ময়লা ফেল কাটি'!
কালীদহের কূলে চল,
সে জলে ধোপ ধরবে ভাল,
পাপ কাষ্ঠের আগুন জ্বাল
চাপায়ে চৈতন্যের ভাঁটি॥

সর্বাণী এবার ভিজে আঁচল মোচড়াতে মোচড়াতে বলে ওঠে, সত্যিই বটে। বাসনাতে আগুন দিয়েছ বটে। তার নমুনা তো এখুনি পাওয়া গেল।

প্রসাদ আকাশের মাতনে একবার তাকান, আমরা কি স্বার্থপরের পারা ব্যবহার কল্লাম!

সর্বাণী, স্বার্থপর! কেন?

প্রসাদ, ঘর-দোর এড়িয়ে একটি নব উন্মাদনার সোয়াদ নিতে কি আমরা অসময়ে মেতে উঠলাম!

সর্বাণী, সে আবার কী কথা! আমরা তো কাউকে বঞ্চিত করিনি।

প্রসাদ, ঘরে তোমার ফুলকচি কন্যে জগদীশ্বরী আছে। তাকে মাই দেওয়ার সময় কখন যে বয়ে গেল।

সর্বাণী, আসবার আগে তাকে দুধ খাইয়ে এসেছি। আমি জানি সে এখন ঘুমুচ্ছে।

প্রসাদ, তোমার পারা হিসেবি আমি আর দু'টি দেখিনি। তুমি আছ বলেই আমি দিব্যি আছি। সংসার

নিয়ে আমার কোনও চিন্তেই নেই বউ।

সর্বাণী বলে, আমার কিন্তু একটি ভিন্ন কথা মনে হচ্ছে এখন। যদি তুমি ভরসা দাও তো বলি।

প্রসাদ প্রশ্ন চোখে এঁকে তাকান শুধু।

সর্বাণী বলে, ওই পঞ্চমুণ্ডি আসনখানির কথা কি মন থেকে নেমে দাঁড়িয়েছে তোমার?

প্রসাদ বলতে গেলে চমকে ওঠেন। মনের ভিতরে বহুদিনের গুপ্ত সাধখানি আজ সর্বাণীর এই কথাপাতে আগুনের মুখ দেখে। তিনি বলে ওঠেন, রামকৃষ্ণধাম! সরকারি খতিয়ানেও তো তাই লেখা আছে।

—হ্যাঁ। সেই কথাই বলছিলাম। সাবর্ণ চৌধুরী দিগ্‌রের বংশধর সেই মানুষটি তো মস্ত সাধক ছিলেন। তান্ত্রিক সাধক।

প্রসাদ, বউ, আমি তো পুরোদস্তুর তান্ত্রিকও নই আবার সাধকও নই। আমি কালীর বেটা হয়ে দু-চার পদ কবিতা রচি। তাতে সুর ছেনে গান করি মহা আনন্দে।

সর্বাণী, কিন্তু তোমার যে ভারী সাধ ছিল রামকৃষ্ণ সাধকের ওই পীঠে বসে আপন মনে মায়ের নাম করবে।

প্রসাদ, তা ছিল বৈকি।

সর্বাণী, স্থানটি তোমার চোখের সুমুখেই গড়-জঙ্গল আর পতিত হয়ে পড়ে আছে।

প্রসাদ, হ্যাঁ, ওই তো, আমাদের সুমুখেই তো পতিতখানি পড়ে আছে। সে কতকাল আগেকার কথা। সাধক রামকৃষ্ণ আজ থেকে বহুকাল আগে গত হয়েছেন। তিনি ছিলেন সাবর্ণ বংশের বিদ্যাধর রায়চৌধুরির প্রপৌত্র। অর্থাৎ কিনা নাতির ছেলে।

সর্বাণী, জমিটি তো জাঙলা হয়ে পড়েই আছে। ওখানে তো ওই বংশের আর কেউ বসে সাধনা করলে না।

প্রসাদ, কিন্তু আমি তো আর ঝপ করে ওখানে বসে পড়তে পারি না। আমার বসবার কোনও হক নেই যে।

সর্বাণী, বেশ তো। যাতে হক হয় তার ব্যবস্থা করতে খেতি কি?

প্রসাদ, তা হলে কী বলছ, হাত পেতে ওঁয়াদের কাছে জমিটুকুন চেয়ে নেবো!

সর্বাণী, পঞ্চমুণ্ডিখানা তো এমনি এমনিই পড়ে আছে। ওটির মালিক এখন সেই রামকৃষ্ণ সাধকের ছেলের বউ সুভদ্রাদেবী। ভারী ভাল মানুষ।

প্রসাদ, তুমি কী করে চিনলে?

সর্বাণী, ফি বচ্ছর দুগ্গোৎসবে নেমন্তন্ন করেন যে। নবমীর দিন ও বাড়ি পেসাদ পাই।

প্রসাদ কিঞ্চিৎ চিন্তিত স্বরে বলেন, আর যাই হোক—তুমি যেন ভুলেও ও-জমিটুকু হাত পেতে চেয়ে নিও না। হোক না সাধনপীঠ। কিন্তু অপরের জমি তো।

সর্বাণী মুখ নীচু করে মাটি দেখে। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে, আমায় চাইতে হবে নাকো।

প্রসাদ, তার মানে!

সর্বাণী, আমার মন বলছে জমিটি উনি তোমার হাতে নিজেই তুলে দেবেন।

প্রসাদ, মন বলছে!

সর্বাণী আর কোনও কথা না বলে ঘরের পানে ফিরে চলে। আর তখনই ঝড় জলের প্রকোপ কমে আসে। হাওয়ার শনশনানির মুখে হাত পড়ে। বিদ্যুৎ ঝিলিকও থেমে থেমে সময় নিয়ে ঘটে। গোটা বনভূমে ডাগর ব্যাঙের পাল গলা ছেড়ে ডাক তোলে প্রকৃতি দুলিয়ে। দূরে কোথায় শিবাদল হাঁকে। রোল তোলে ঝিঁঝিঁর দল মহা আনন্দে। সংসার বুঝি জুড়িয়েছে। সারাদিনের তাপঝাল এখন ক্ষান্ত।

রামপ্রসাদ চোখ তুলে তাকান নিঝুম ঝিঁ ঝিঁ উচ্চকিত পঞ্চমুণ্ডি আসনের দিকে। কতদিন আগে প্রতিষ্ঠিত ওই পীঠ এখন অব্যবহৃত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে আছে একধারে। ঝুরিগুলি টলমল দুলছে নিকষ অন্ধকারে। সেই দোলন বলে দিচ্ছে অতি গুহ্য আর জটিল তন্ত্রাচার তত্ত্ব। তার অনেকগুলিই দুরূহ আর অনতিক্রম্য।

ইড়া পিঙ্গলাস্থিত প্রাণসমূহকে সুষম্নায় প্রবেশ করাতে হবে। সুষম্না হল শক্তি। প্রাণরূপ জীব হল শিব। এ দু'টিতে মিলে এবার সঙ্গমে রত হবে। এর নাম সিধে কথায় মৈথুন। বীর্যপাতের সময় যে-সুখ হয় তার চেয়ে কোটিগুণ সুখ হয় এই রমণে। সাধারণ মৈথুনে তেজের ক্ষয় হয়। দেহ অবসিত হয়। তাকে বলা যায় গর্দভেরই মতো রমণ।

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং নিত্যাং কামানন্দশিখোপমাম্।

কামজনিত যে-আনন্দ হয় তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আনন্দতুল্য হল কুণ্ডলিনীর ধ্যান।

এ কথা মনে হতে প্রসাদ মনে মনে চমকে ওঠেন। এইসব তত্ত্বকথার সঙ্গে তাঁর জীবনধারা যে মেলে না।

তাঁর ঘর, সংসার, অন্নসংস্থান মিলিয়ে মিশিয়েই তো কবিতার সঙ্গে দিনাতিপাত। এমনকী একটু আগেও স্ত্রী সর্বাণীর সঙ্গে ঝঞ্ঝা-বৃষ্টিতাড়িত উদোম আকাশতলে, গাছপালা আর কিছু তথাকথিত প্রাণীদের সাক্ষ্য করে যে-রতিলীলা ঘটে গেল তার নাম বুঝি রসআনন্দ। এই আনন্দ একেবারেই জাগতিক। এই আনন্দ উপভোগের পরে কোথায় অবসাদ! কোথায়ই বা তেজের ক্ষয়। এ তো নতুন করে উজ্জীবিত করল। প্রসাদের মনে হল এই আনন্দকে কবিতায় দূরের কথা মুখেও প্রকাশ করা যায় না।

রামপ্রসাদের মধ্যে এক আশ্চর্য উতরোল জেগে ওঠে। যদি এ কথা সত্য হয় যে মৈথুনেন বিনা মুক্তির্নতি—মৈথুন বিনা মুক্তি লাভ ঘটে না, তা হলে তার জন্যে এত আয়োজন বা হুক কেন।

যোনিং বিনা মহেশানি সর্বপূজা বৃথা ভবেৎ—যোনি পূজা ভিন্ন অন্য সমস্ত পূজাই নিষ্ফল—এই যদি সার সত্য হয় তা হলে তন্ত্রাচারীর সংসার থেকে কী কাম!

রামপ্রসাদ বুনো ভিটের আওতা ছেড়ে পথে যান। বৃষ্টি থেমে গেলেও মাথার আকাশে বিদ্যুৎ এখনও রেহাই দেয়নি। সেই আকাশতল বরাবর তিনি ভারী বিচলিত গতিকে পথ হাঁটেন।

বাঁয়ে বুড়ো শিবের মন্দির। পথের দু'ধারে গাছপালায়, ঝোপেঝাড়ে ভিজে স্বভাবের আঁকড়ে-বাঁকড়ে জোনাই জ্বলছে। ব্যাঙ ডাকছে। প্রসাদ একা এসে উপনীত হন নিবিড় বিস্তৃত গঙ্গার ধারে। এই বর্ষার অন্ধকারে গঙ্গার কলকল মৃদু কোলাহলের বুকে ঢেউ ভাঙছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে স্রোত উচ্চারিত হচ্ছে। সেই স্রোতের বুকে অগণ্য চক্ষু জ্বলছে কালো আকাশের দিকে, কটাক্ষপাত করে। প্রসাদ সেই কটাক্ষের মাঝখানে নিজের তীব্র আর এখন কিঞ্চিৎ নাচার চক্ষুজোড়া পেতে দেন।

প্রসাদ এই নিরালম্ব জনপ্রাণীহীন রাত্রির গঙ্গায় চক্ষু হেনে হেঁকে ওঠেন, শোন মা গঙ্গা, ভাল করে তা হলে শুনে নে। মনে করিসনে এ মাতালের প্রলাপ।

গঙ্গা জননী কিংবা কন্যে মুখ টিপে হাসে। ছিমিছিমি স্রোতের ভিতর থেকে রিনরিনে সুরেলা স্বরে বলে, বল বাপ। কী বলবি বল না।

প্রসাদ টলোমলো স্বরে বলেন, তুই আমায় যেমন রাজ্যের খপরপত্তর দিস, আমারও তো তোকে কিছু দেওয়ার থাকতে পারে। পারে কি না।

গঙ্গা কন্যে এবার কলকলিয়ে হেসে ওঠে, বাপ রে বাপ, ছেলের মান যে খুব ভারী। বল ছেলে বল।

রামপ্রসাদ আকাশে দু'হাত ভাসিয়ে দেন।

মন কি কর ভবে আসিয়ে।
ওরে দিবা অবশেষ, অজপার শেষ,
ক্রমেতে নিঃশ্বাস যায় ফুরায়ে।।
হং বর্ণ পুরকে হয়, সং বর্ণ রেচকে হয়,
অহর্নিশি কর জপ 'হংস হংস' বলিয়ে।।
অজপা হইলে সাঙ্গ, কোথা তব রবে রঙ্গ,
সকলি হইবে ভঙ্গ, ভবানীরে গো ভাবিয়ে।
চলনে দ্বিগুণ ক্ষয়, ততোধিক নিদ্রায় হয়,
বিনয়ে রামপ্রসাদ কয়, ততোধিক সঙ্গম সময়ে।।

পরদিন সকাল থেকেই বাড়ির আত্মীয়কুটুম পাততাড়ি গোটাতে আরম্ভ করে। আমাদের সদরে একে একে রিকশা এসে লাগে। মানুষ তুলে নিয়ে যায়। আবার ফিরে আসে। এইরকম খেপে খেপে বাড়ি ফাঁকা হতে থাকে। কেবল রয়ে যান ক'জন। আমার দিদিমা আর কতিপয় বৃদ্ধা।

বেহালার দাদুর রিকশায় বেশ কিছু পুঁটলি আর গাঁঠরি ওঠে। ওঠবার আগে আমার দু'গালে দু'টি সশব্দে চুমো খান। তারপর তাঁর সেই গমগমে গলা ভাসিয়ে বলে ওঠেন, দু'বেলা মন দিয়ে সন্ধ্যা-আহ্নিকটা করো ভাই। এতে তোমার শরীর, মন দুই ভাল থাকবে। মনে থাকবে তো?

আমি মাথা কাত করি। দাদু এবার ফতুয়ার পকেট থেকে একটি গহনার ডিবে বার করেন। ঢাকনা খুলে একটি সোনার আংটি বার করে আমার ডান হাত টেনে নিয়ে পরিয়ে দেন

—এটা তোমার দিদি পাঠিয়েছে। আমি কিছু দিলুম না কিন্তু।

রিকশা উড়ে যায়। পেছন থেকে মাথার ওপর ধবধবে কুচি কুচি চুলের পেছন বাগে ধারালো শিখার ন্যাজ জেগে থাকে আমি নিজের মাথার পেছনে হাত দিই। নেড়া মাথার পেছনে পুঁচকে টিকিটা লিকলিক করছে।

আমি—হাফ প্যান্ট, নেড়া মাথা, শার্ট, খালি পা এবার বাড়ি থেকে সটান বেরিয়ে উধাও। যেন কতকাল বন্দিদশা পার করে এবার হাঁপ ছাড়লাম। যাব কোথায়? কোথা তো বটে। তা সেই বটে আমায় একলা একলা টেনে নিয়ে গেল বাড়ির পেছনে মস্ত পুকুরের পাড়ে। সার সার খেজুর গাছে কাঁচা-পাকা ফলের থোলো ঝুলছে। গাছের নীচে চোত মাসের রোদের উচ্ছিষ্ট ছায়া। বেঁচির ঝোপ। ভয়ঙ্কর কাঁটা শানানো বুনো ফল গাছ। পাকা পাকা দেখে ফল ছিঁড়ি আর মুখে দিই টক টক, মিষ্টি মিষ্টি। কী চমৎকার স্বাদ।

পুকুরের ওপারে ক্ষিতীশ দাদু জলচৌকি পেড়ে হুইল খাটিয়ে মাছ ধরতে বসেছেন পাশে বাগদি পাড়ার ভেনো। সে চার, চা এসব জোগান দিচ্ছে। আমি পুকুর পাড় বেয়ে ঘুরতে ঘুরতে ওধারে এলাম। মাঝখান দিয়ে একটা উঁচু বাঁধ দিয়ে আর একখানা ছোট পুকুর আলাদা করা। ওটা ক্ষিতীশ দাদুদের সেই বাঁধ ধরে লাফাতে লাফাতে এগোই সামনে দাদুদের মস্ত বাগান। আম, জাম, বাতাবি লেবু, খেজুর, চালতা, নারকোল—কী নেই। তাদের মাঝখানে ডাঙা একজোড়া তাল গাছ দু'টি বোন হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তাদের টঙে ফিরফিরে বাতাস হচ্ছে।

পেছনে গিয়ে দাঁড়াতেই ক্ষিতীশ দাদু মস্ত চোখজোড়া পাকিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকান। কী চমৎকার—সিনেমার ছবি বিশ্বাস ধাঁচের চেহারা, ফর্সা রং, কাঁধের কাছে কী বাহারি খাঁজ। আমার দিকে কটাক্ষ করে বলে ওঠেন, এখানে কী মনে করে!

আমি বলি, এমনি।

—হুঁ এমনি। পেতের জন্যে গরুটা বাঁধা ছিল। এবার খালাস পেয়েছে।

আমি প্রশ্ন করি, মাছ খাচ্ছে দাদু?

এবার ধমক, উঁ উঁ উঁ। কথা বলবি না। মাছ পালাবে।

আবার প্রশ্ন, জলের তলায় মাছ কি শুনতে পায়?

আবারও কড়কানি, তুই চুপ করবি!

লম্বা বহর করে সুতো ফেলা বেশ খানিক দূরে। একজোড়া হুইলের দু'টি ফাতনা পাশাপাশি সোদর ভাইসম জলের বুকে জেগে আছে। সাদা দেহে লাল-সবুজ রঙা সুতোর গয়না। দাদুর পাশে একটা থলিতে নানা চার রাখা। কী চমৎকার ভাজা ভাজা গন্ধ বেরচ্ছে ওখান থেকে। আমারও একটু খেতে ইচ্ছে করছে।

পাশে বসা ভেনোর পাড়ায় অপর নাম ঠোঁটকাটা। আসলে ওপর ঠোঁটের একস্থান থেকে কে যেন খাবলে তুলে নিয়েছে। তার ফাঁক দিয়ে দন্ত দেখা যায়। একে নাকি গন্নাকাটা বলে।

ভেনো বলে, কী দাদু, একটু খানি খোল ভাজা দেবো?

দাদু গম্ভীর বলেন, দে।

ভেনো থলির ভেতরে হাত ভরে একমুঠো খোল ভাজা তুলে নেয়। তারপর ছিটিয়ে দেয় ফাতনার আশেপাশে।

একটু পরেই ফাতনায় টুকটুক। ভেনো বলে, চুপচুপ। এবার টক টকাটক, টক টকাটক। তারপর সাঁ করে ডুব। অমনি দাদু দু'হাতে ছিপ তুলে হ্যাচাং টান। ছিপের হুইলে কিরকির, কিরকির শব্দ। সোঁওও করে সুতো বয়ে যায় দূরে। ওপারের মেটে রাস্তায় একজন লোক সাইকেল থেকে নেমে তটস্থ চেয়ে থাকে এই দিকে। ভেনো উত্তেজিত উঠে দাঁড়িয়ে কতক দম বন্ধ অবস্থায়। দাদুর হাতে ধরা ছিপের ডগা বেঁকে গিয়ে জলমুখো। দাদু চোখ পাকিয়ে একটু বেঁকে দাঁড়িয়ে বলে ওঠেন, ভেনো, কলটা মুখে ধর। মুখে—ভেনো অমনি দাদুর পাশ থেকে হাঁপানির ফোঁকা কলটা তুলে নিয়ে তাঁর মুখে ধরে। দাদু হাঁ করেন। তলার পাম্পটা ফ্যাঁস ফ্যাঁস কপচায় ভেনো। দাদু খপাত খপাত টেনে নেন ওই রবারের বলের ভেতরে পোরা দম। তারপর হুইলের চাকা ঘুরিয়ে সুতো গোটাতে থাকেন।

জলের মধ্যে হুলুস্থুল হতে থাকে। হঠাৎ একটি শূন্যে লাফ। মস্ত এক রুই লাফ দিয়েই আবার জলে সেঁধোয়। তার লেজের কাছে আর কানকোর পাশে লালচে ছোপ। কে যেন পটেশ্বরী দিদির আলতার তুলি ওখানে ছুঁইয়ে দিয়েছে।

মাছটা খেলিয়ে খেলিয়ে যখন ঘাটের আওতায় আসে তখন সে রীতিমতোন এলিয়ে গিয়েছে। ঘাটের আওতায় জল কলমির ঝোপে তার লালচে লেজখানা কী চমৎকার মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। লেজ দিয়ে জলে ছবি আঁকছে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। চওড়া কানকোয় রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। অতি শান্ত আর সুশীল চোখজোড়া কীরকম আর্ত ভেসে আছে জলের গায়ে। সেই চোখ এইমাত্র ফোঁকা কল টানা ক্ষিতীশ দাদুর কাছাকাছি।

ভেনো বলে ওঠে, দাদু, মাছটার পেট ভর্তি ডিম আছে। বেশ বড়া হবে।

আমি ভাবি, তার মানে আরও কত মাছের প্রাণ ওর পেটে।

(চলবে)

ছবি শান্তনু দে


আরামের সঙ্গী

পায়ের আরামের শেষ কথা। এই জুতোর আছে পায়ের প্রেশার পয়েন্টগুলির জন্য বিশেষ সাপোর্ট, যাতে আপনার পায়ে কোনওরকম চাপই না পড়ে।

softouch

Khadim's আর্টিকেল নম্বর 759059759 দাম 695 টাকা

bates 130

রো
রোববারের
মেগা

# ঝিলডাঙার কন্যা

প্রচেত গুপ্ত

**শুটিংয়ের মাঝে ঝামেলা শুরু করে মোম চ্যাটার্জি। মাথা ধরেছে বলে ফ্লোর ছেড়ে মেকআপ রুমে চলে যায় সে। শুদ্ধনাথ যায় তাকে মানাতে। অনেক ধানাইপানাইয়ের পর মোম আবার ফ্লোরে আসতে রাজি হয়। মেকআপ করতে করতে একটা ফোন আসে। সোমনাথ বলে কেউ ফোন করেছে।**

কুড়ি

**আজ 'চিত্তশুদ্ধি' কর্মসূচিতে রয়েছে মনিষীদের জীবনী** পাঠ।

বাইরের কেউ নয়, পড়ার দায়িত্ব পেয়েছে গাব্বু। গাব্বু মানা সরকারের পছন্দের ছেলে। গলা ভাল। মিছিল, স্লোগানে লিড দেয়। শুধু মিছিল, স্লোগান নয়, এই ছেলে অ্যাকশনেও পটু। ওয়ান শটার, গাদা, ছররা সবই চালাতে পারে। যদিও এগুলো খুব একটা লাগে না। আপাতত এলাকা মোটের ওপর শান্তই। কেউ ট্যাঁ ফোঁ করলে ধমক, হুমকি, খুব বেশি হলে নিরামিষ লাঠি সোঁটাতেই কাজ চলে যায়। তবে এখন গাব্বুকে দেখলে কে তার এসব গুণপনা বুঝবে? 'দাদা'র দেওয়া নতুন দায়িত্বে সে যেমন আহ্লাদিত, তেমন নার্ভাস। যতই হোক লেখাপড়ার ব্যাপার। কাচা পায়জামা, পাঞ্জাবি পরেছে। দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরেছে একেবারে কাকভোরে। চোখ মুখে একটা একটা 'ভক্তি ভক্তি' ভাব।

'শ' এবং 'স' নিয়ে কিছু অসুবিধে থাকলেও গাব্বু পড়ছে খারাপ না। বেশ গড়গড়িয়েই যাচ্ছে। হোঁচট খেল শেষের মুখে। নারী নির্যাতনের সীমা ছিল না। কুলীন ব্রাহ্মণেরা হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে অনেকগুলো বিবাহ করিতে পারিতেন। পিতা-মাতারা কুলীন পাত্রের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দিয়া কুলধর্ম বজায় রাখিতেন। এক একজন বৃদ্ধের সঙ্গে কত যে মেয়ের বিবাহ হইত তাহার হিসেব নাই। মেয়েরা বিবাহের পর নিজ নিজ পিতৃলয়েই থাকিয়া যাইত। স্বামী ঘরে নিত না। কালেভদ্রে অতিথির মতো উপস্থিত হইয়া সেবা লইত। বহু বিবাহের এই কদর্য রীতি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘৃণা করিতেন। অনেক মেয়ের আট নয় বৎসর বয়েসের মধ্যেই বিবাহ হইয়া যাইত। কিছুদিনের মধ্যে বৃদ্ধ স্বামী মারা যাইলে বাকি জীবন কঠিন বৈ...বৈ...বৈ...।'

মানা সরকার ভুরু কোঁচকালেন।

'কী হল আটকে গেলি কেন? বেশ তো চলছিলি।'

গাব্বু আমতা আমতা করে মাথা চুলকে বলল, 'না দাদা, আটকায়নি এই জায়গাটা ঠিক বলতে পারছি না।'

মানা হাত বাড়িয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, 'দেখি দে, বইটা দে।'

হাত বাড়িয়ে 'মনীষী জীবন কথা' টেনে নিয়ে মাদুরের ওপর পেতে ধরলেন মানা সরকার।

'ওফ, এ তো বৈধব্য বৈধব্য পড়তে পারছ না গর্দভ? ছি ছি। দেখ কী লেখা আছে, লেখা আছে, বৃদ্ধ স্বামী মারা যাইলে বাকি জীবন কঠিন বৈধব্যের নিয়মকানুন মানিয়া চলিতে হইত। নে বাকিটুক পড়ে ফেল। এই জন্যই বলি লেখাপড়া তো কিছু করবি না, শুধু ঝান্ডা, ডান্ডা নিয়ে কী আর চলে? নে নে পড়।'

গাব্বু ফের শুরু করতে গেল। ঘরে ঢুকল খগেন। একে টপকে, ওকে সরিয়ে সোজা চলে এল মানা সরকারের ঘাড়ের কাছে। অন্য কেউ হলে পারত না। চিত্তশুদ্ধির সময় কারও ঘরে ঢোকার পারমিশান নেই। খগেনকে শুধু দায়িত্ব দেওয়া আছে। সে বাইরে থাকবে, কেউ এলে 'দাদা'কে এসে খবর দেবে। আগে এটুকু নিয়মও ছিল না। ইলেকশনের টিকিট নিয়ে ভিড় শুরু হওয়ার পর থেকে হয়েছে টোপ ফেলা শুরু হয়েছে। বলা যায় না, কখন রুই কাতলা এসে ধরা দেবে। খেয়াল রাখতে তো হবেই।

খগেন মুখ নিচু করে মানা সরকারের কানে কানে কিছু বলল। মানা মুখ তুলে বিরক্ত গলায় বললেন, 'কে? কে এসেছে বললি?'

'কাদু।'

'কাদু! সেটা আবার কে?'

'ঝিলডাঙার কাদু।'

থমকালেন মানা। এই লোককে এখনও খবর দেননি তিনি। তবে দেবেন বলে ঠিক করেছেন। কয়েকদিনের মধ্যেই ডেকে নেড়েচেড়ে দেখবেন। তার আগেই চলে এল! নিশ্চয় খবর পেয়েছে। মানা সরকার ঠোঁটের ফাঁকে মুচকি হাসলেন। যদিও সেই হাসি অন্য কেউ দেখতে পেল না। নেতা মানুষদের এই এক মজা। তাদের হাসি, কান্না চট করে কেউ দেখতে পায় না।

মানা সরকার খুশি হলেন। নিজে চলে আসা লক্ষণ হিসেবে ভাল। ডেকে এনে ভোটে দাঁড়ানোর কথা বললে অনেক সময় ভাঁও বেড়ে যায়। নিজে এলে উল্টোটা। টাকা পয়সার জন্য চাপ বেশি দেওয়া যায়। তবে এই লোকের কাছে চট করে মুখ খোলা যাবে না। আগে ভাল

করে খেলিয়ে দেখতে হবে। ঝিলডাঙার কাদু সম্পর্কে এখন পর্যন্ত যা রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে তাতে এই লোক সাধারণ বদ নয়, বাড়াবাড়ি রকমের বদ। বাড়াবাড়ি রকমের বদদের নিয়ে কাজ করতে মজা। কাঁচা পয়সার বদ হলে সেই মজা ডবল।

ঠোঁটের লুকোনো হাসি মুছে মানাবাবু বললেন, 'অপেক্ষা করতে বলো।'

খগেন ঘাড় নেড়ে চলে যেতে গেলে মানা তাকে আবার কাছে ডাকল। নিচু গলায় বলল, 'সঙ্গে কেউ আছে?'

'না, একা এসেছে। মোটরবাইকে।'

'বারান্দায় একটা চেয়ার পেতে দে।'

'আচ্ছা। চা দেব?'

'না, তার দরকার নেই, শুধু বসতে দিলেই হবে।'

খগেন চলে যেতে মানা বুকের দু'পাশে তৃপ্তির হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, 'নে গাব্বু, শুরু কর। বড় মানুষদের কথার মাঝখানে বাধা ভাল লাগে না।'

তৃপ্ত কাদুও। তাকে অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে। ইচ্ছে করলে ঘুরিয়ে দিতে পারত। সে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসেনি। তাছাড়া না ঘোরালে নেতা হওয়া যায় না। যে নেতা যত বেশি হারামজাদা সে তত বেশি ঘোরাবে। কখনও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে, কখনও কোমরে দড়ি বেঁধে ঘোরাবে। মানা সরকারের সঙ্গে তার একেবারেই পরিচয় নেই এমন নয়। তবে সেটা কয়েক বছর আগের ঘটনা। মনে রাখার মতো কিছু নয়। তারওপর আবার ভিড়ের মধ্যে দেখা। ওই লোক ঝিলডাঙাতেও গিয়েছে। কালেভদ্রে গিয়েছে। ভোটটোটের সময়। কাদু তখন নিজেকে সরিয়ে রাখত। পার্টি পলিটিক্স থেকে যত দূরে থাকা যায় তত ভাল। যাকে যখন দরকার তার কাছে যাওয়া যায়। এই এখন যেমন আসা গিয়েছে। বড় কাজে পার্টি পলিটিক্স লাগে। সে বড় কাজ করতে চায়।

খগেন বলল, 'আপনি ভেতরে এসে বসুন।'

কাদু লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'না না তার দরকার নেই। মানাবাবু বুঝি মিটিং করছেন?'

'মিটিং নয়, চিত্তশুদ্ধির প্রোগ্রাম চলছে।'

কাদু একটু ভেবাচাকা খেয়ে যায়। বলে, 'কী শুদ্ধি!'

'চিত্তশুদ্ধি। পার্টি প্রোগ্রাম।'

কথাটা বলে খগেন হাসে। অন্য লোক হলে বলত না,

এই লোককে বলা যায়। 'দাদা' চেয়ার দিয়ে বসাতে বলেছে মানে এই লোক আর পাঁচজনের মতো নয়। যতই বদ হোক এখন গুরুত্ব আছে। রাজনীতিতে গুরুত্ব লোক বুঝে হয় না, সময় বুঝে হয়। কাল যে ফালতু ছিল, আজ সেই হয়তো সব থেকে দরকারি।

কাদু হাতের মিষ্টির বাক্সটা বাইকের সিটে রাখল। সন্দেশ এনেছে। যদিও সে ভাল করেই জানে নেতা মানুষরা সাধারণত মিষ্টি পছন্দ করে না। তারা পছন্দ করে টক বা ঝাল। মানা সরকার সম্পর্কে তার যেটুকু জানা আছে, তাতে এই লোক আবার টক ঝাল দু'টোই পছন্দ করে।

সেই ব্যবস্থা হয়েছে। বড় কাজের জন্য বড় ব্যবস্থা।

'প্রোগ্রাম শেষ হতে অনেকক্ষণ লাগবে ভাই? ঘণ্টাখানেক?' কাদু বিনয়ী গলায় জানতে চাইল।

খগেন বলল, 'ঘণ্টাখানেক না ঘণ্টাদুয়েক বলতে পারব না। আপনি ভেতরে আসতে পারেন।'

'কোনও অসুবিধে নেই। আমি এখানেই রইলাম। ছায়া টায়া আছে। আমার তো মিনিট পাঁচেকের কথা।'

খগেন চলে যেতে যেতে বলল, 'দাদার কিন্তু জেলায় মিটিং আছে। বেশিক্ষণ আটকাবেন না। ঠিক আছে বাইরেই অপেক্ষা করুন। খবর দেব।'

কাদু ঘণ্টাখানেকের জন্য মনে মনে তৈরি হল। ডাক পড়ল কুড়ি পঁচিশ মিনিটের মাথায়। বাক্স হাতে নিয়ে ছুটল।

খগেনকে ইশারায় দরজা বন্ধ করতে বলে মানা সরকার বলল, 'বসো কাদু, আছ কেমন?'

লোকটা কি তাকে চিনতে পেরেছে? কাদু মোড়া টেনে বসতে বসতে অবাক হল। কী করে চিনতে পারবে? ফলস দিচ্ছে না তো? হতে পারে। এরা ফলস দিতে পছন্দ করে।

'দাদা, আমায় কি আপনার মনে আছে? সেই যে ঝিলডাঙায় আপনি গিয়েছিলেন। তাও বছর তিন হয়ে গেল।'

মানা সরকার মুচকি হেসে বললেন, 'মানুষ কি শুধু আগে দেখা থাকলেই চেনা যায়? অ-দেখা লোক কত সময় চেনা ঠেকে, আবার বহুদিনের চেনা লোকও দুম করে অচেনা হয়ে যায়। ঠিক লোককে চিনতে অসুবিধে হলে আমাদের চলবে কেন কাদু? আমাদের মানুষ নিয়ে চলতে হয় না?'

কাদু মনে মনে বলল, শালা হারামি। জ্ঞান ফোটায়। চিনতে পেরেছে না কচু। হাবিজাবি বলে ঘাবড়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মুখে হেঁ হেঁ ধরনের ভঙ্গি করে বলল, 'সে তো বটেই দাদা। আপনারা মানুষ নিয়ে চলবেন না তো কে চলবে? দাদা, ওই বুদ্ধি-শুদ্ধি ব্যাপারটা কী?'

মানা কাদুর মুখে দিকে তাকিয়ে জোরে হেসে উঠলেন।

'না না, বুদ্ধি শুদ্ধি হবে কেন? ও হল চিত্তশুদ্ধি। চিত্ত বোঝ? চিত্ত?'

কাদু গোবেচারা মুখ করে মাথা নাড়ল। হারামিটার সামনে যত বোকা সাজা যায় তত ভাল। খেলাতে সুবিধে হবে।

'চিত্ত হল তোমার মন, অন্তর। সেই অন্তরের কালি দূর করাই হল চিত্তশুদ্ধি। আমাদের পার্টির প্রোগ্রাম। চলবে কয়েকমাস। তুমিও এসো কাদু। ইচ্ছে হলে চলে এসো। ধর্মকথা, মনীষী জীবন পাঠ হয়।'

কাদু মাথা নামিয়ে বলল, 'ইচ্ছে তো হচ্ছে দাদা, কিন্তু আপনাদের পলিটিক্সের ব্যাপার, আমি আসি কী করে?'

'কী যে বলো না। আমি ছেলেদের বলে রেখেছি, যাতে খুশি পার্টিবাজি করো বাপু, চিত্তশুদ্ধিতে কোনও পার্টিবাজি চলবে না। এখানে সবাই সমান। এই যে এত মানুষ আজ এসেছিল, তুমি তো নিজের চোখে দেখলে, তারা কী সব আমার দলের? মোটেও নয়। নিজের টানেই এসেছিল।'

কাদু মনে মনে বলল, নিজে এসেছিল না কাকের গু এসেছিল। শালা, তোমার ভয়ে সুড়সুড় করে এসেছিল। আমি যেমন এসেছি। তবে ভয়ে আসিনি, এসেছি তোমাকে গাঁথতে। টোপ মেরে বড়শিতে গাঁথতে।

'সে তো আসবেই দাদা। আপনার টানে আসবে না তো কার টানে আসবে? আমিও তো ঝিলডাঙা থেকে ছুটে এলাম।'

মানা মিথ্যে করে হাসলেন এই লোক শুধু খারাপ নয়, সেয়ানাও। সাবধানে এগোতে হবে।

'এবার বলো, ছুটে এলে কেন?'

'দাদা, একটা আর্জি আছে

কাদু বসে আছে মোড়ায় নেতার নীচে বসা নিয়ে সে কোনও আপত্তি করেনি। মানা সরকারের মাটিতে বসার ঢঙের খবর সে জেনেই এসেছে। দু'হাতে মোড়াটাকে সামান্য সামনে টেনে আনল। মানা চোখ নামালেন। আর্জি? এবার নিশ্চয় বেটা ইলেকশনের কথা বলবে। বলবে, দাদা, ঝিলডাঙার টিকিটটা আমায় দিন। এই বদের সঙ্গে টাকা পয়সার কথা কি সরাসরি বলতে হবে? নাকি খেলিয়ে বলা উচিত? মনে হচ্ছে, খেলিয়ে বলা উচিত।

'আর্জি! আবার আর্জি কীসের হে?'

'দাদা, আমার ওখানে একবার যেতে হবে।'

'ওখানে মানে? ঝিলডাঙায়? কী হল আবার? ফুটবল ম্যাচ? নাকি সংবর্ধনা? বাপু হে সংবর্ধনা টংবর্ধনায় আমাকে ডেকো না। ফুল মালায় আজকাল বড় ক্লান্ত লাগে।'

কাদু মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে উঠল। একবার চল না শালা ফুল মালা কাকে বলে দেখতে পাবি। সে বুকের কাছে হাতদু'টো জড় করে মিনতি করার কায়দায় বলল, 'না-না ওসব কিছু নয়, অনেক দিনের ইচ্ছে, দাদাকে একবার আমার অফিসটা দেখাই।'

মানা সরকার ভুরু কোঁচকালো। অফিস! এ ছেলে আবার কীসের অফিস করল? পার্টি অফিস নাকি? কই তাকে তো এই খবর কেউ দেয়নি! বরং শুনেছিল কাদু পলিটিক্সের ধারে কাছে নেই। কে জানে হয়তো এই দু-তিন দিনের মধ্যে খুলে বসেছে। ইলেকশনে দাঁড়ানোর প্রস্তুতি। আজকাল পার্টি অফিস বানাতে সমস্যা নেই। কটা টেবিল চেয়ার, আর বাড়ির মাথায় পতাকা। ব্যস, তাহলেই হল। এরকম আকছার হচ্ছে।

'তুমি আবার কীসের অফিস করলে কাদু?' মানা সরকারের চোখে কৌতূহল।

কাদু লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'চালকলের অফিস দাদা।'

আরাম অবিরাম। এখনও দাম কম!
02021
Rs. 590/-
Size: (5-10)
Sreeleathers
বিশ্বমানে। খাঁটি দামে।
শ্রীলেদার্স নিয়ে এল বিশ্বমানের আরামদায়ক জুতোর এক নতুন রেঞ্জ। আর দাম ? যথারীতি নাগালের মধ্যে।
শোরুম ও অনুমোদিত বিক্রয়কেন্দ্রঃ
কলকাতা: লিন্ডসে স্ট্রিট (২২৮৬১৫১১), ফ্রি স্কুল স্ট্রিট (২২৮৬১৫০৬), কলেজ স্ট্রিট শোরুম (মার্কাস স্কোয়ার - ২২১৯৭৯৮৪), বেহালা মার্কেট (২৪৬৮১৩৪১), গড়িয়া বসু মার্কেট (২৪৩০৩০৭৬) | হাওড়া (২৬৪১০৬০৮) | ডোমজুড় (২৬৭০৫৩৫৪) | নৈহাটী (২৫০২ ৩২৯৩) বর্ধমান | দুর্গাপুর | আসানসোল | বহরমপুর | পুরুলিয়া | জামশেদপুর | ধানবাদ | রাঁচি | হাজারিবাগ | ভাগলপুর | মুজফ্ফরপুর | পাটনা | কটক | ভুবনেশ্বর | আগরতলা | বারানসী | রায়পুর | গুয়াহাটি | দিল্লী
Genesis 2495

মানা অবাক হয়ে বললেন, 'চালকল! আমি যে শুনলাম তোমার ব্যবসাপাতি হুগলি না বর্ধমানের দিকে।'

কাদু ঢোঁক গিলল। হারামজাদা তার ব্যবসাপাতিরও খবর রাখে! ভাল, টাকার মুরোদটা জানা দরকার। সে হাত কচলে বলল, 'আপনি তো জানেন দাদা, বাপ, ঠাকুরদার অন্নপূর্ণা রাইসমিলের একটা ব্রাঞ্চ খুলেছি গাঁয়ে। ঝিলডাঙার লোকের সুবিধের জন্যই খুলেছি। বেচারিদের সদর পর্যন্ত ছুটতে হয়। নিজের গাঁয়ের মানুষজনকে দেখব না তো কাকে দেখব বলুন?'

মানা সরকার খুশি হলেন। ব্যবসা ছড়াচ্ছে মানে বদটার জোর আছে। বদ মানুষের জোর থাকা ভাল জিনিস।

'তোমাদের একটা ইঁটভাটা আছে না কাদু?'

'আছে, ছোটখাটো একটা আছে, বড় কিছু নয়। একটা ক্লোড ইস্টোরেজও করেছি। একটা ভিডিও হল দেব ভাবছি।'

'বাঃ, ভেরি গুড। এই তো চাই। এখন হল ব্যবসার যুগ। গোটা দুনিয়া ব্যবসায় মেতেছে। আর বাঙালি? বাঙালি কী করছে দেখ, শুধু চাকরি চাই আর চাকরি চাই। চেয়ে চেয়ে জাতটা একেবারে চাওয়া জাত হয়ে গেল হে। উচ্ছন্নে গেল। ছ্যা ছ্যা। এই সময় তোমরা যদি এগিয়ে না আস তা হলে কে আসবে? সৎ, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান একটা জাতি একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে আর আমরা বসে বসে দেখব।'

নিজের প্রশংসা শুনে কাদু কালো দাঁত বের করে হাসল। খচ্চরটা বকে বেশি। নেতা মানুষ বকবেই। তবে বেটা যে টাকা পয়সার গন্ধ পেয়েছে এটা ধরা পড়ে যাচ্ছে। এবার অন্য জিনিসের গন্ধ পাওয়াতে হবে। তা হলেই কাজ হাসিল।

'চেষ্টা করছি দাদা। আপনার আশীর্বাদ চাই। এ তল্লাটে আপনার আশীর্বাদ ছাড়া কাজ করব, এমন সাহস আমার নেই।'

মানা সরকার চুপ করে রইলেন। ছোকরা শুধু বজ্জাত নয়, ভাল খেলোয়াড়। কিন্তু ভোটে দাঁড়ানোর কথা কিছু বলছে না কেন? ধান্দা কি অন্য?

'দাদা, পায়ের ধুলো পাব তো?'

'বাপু আমায় ছেড়ে দাও। দেখতেই তো পাচ্ছো রাজনীতি নিয়ে নাজেহাল হয়ে আছি। সারাদিনই ছোটাছুটি করি। একটু ফাঁক পাই না।'

কাদু কথাটা লুফে নিল। বলল, 'জানি দাদা, দিনে আপনার অনেক কাজ। সেই সময় বিরক্ত করতে চাই না। রাতের বেলায় চলুন। এই বিকেলের পর। আমার অফিসে বসেই একটু খাওয়া-দাওয়া করবেন। রাতের খাওয়া।'

মানা সরকার ভুরু কোঁচকালেন। শয়তানটা রাতে নিয়ে যাবে কেন? মতলব কী?

'আজকাল রাতে কোথাও যাই না কাদু। দিনকাল ভাল না। গাঁ গঞ্জের লোকদেরও বিশ্বাস নেই। হুট বলতে কী করে বসে। ভোট টোট ছাড়া দেখই তো অচেনা পাড়ার ভেতরে ঢুকি না পারতপক্ষে।'

কথাটা বলেই মানা সরকার বুঝতে পারলেন কাজটা ঠিক হল না। বদটা তাকে ভীতু না ভেবে বসে। পরিস্থিতি সামলাতে গলা নামিয়ে বললেন, 'আসলে কী জানো বাপু, এখন গাড়ি ছাড়া তেমন নড়াচড়া করতে পারি না। বয়স বাড়ছে। একটু—আদটু হল তো ঠিক আছে। তোমাদের ওখানে তো গাড়ি ঢোকে না। খালের পুল পেরোতে হয় হেঁটে।'

শালার শালা। কাদু আবার জ্বলে পড়ল। মানা সরকারের জন্য যে টক ঝালের ব্যবস্থার কথা সে ভেবেছে তা হল রাতের ব্যবস্থা। দিনে সে জিনিস হবে কী করে? কিন্তু উপায় তো কিছু নেই। এই লোক যদি রাত বলে তা হলে রাত, যদি দিন বলে তা হলে দিন। সব মেনে নিতে হবে। সে খানিকটা কুঁজো হয়ে বলল, 'কোনও অসুবিধে নেই, আপনি দাদা দিনেই আসুন। সকালে আসতে বলছি না, দুপুরের দিকটায় আসুন। আমার লোক খাল পুলে গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে, হাঁটতে হবে না, বাইক থাকবে। আমার নতুন অফিস, বাড়ির দিকটা একেবারে ফাঁকা। কেউ থাকবে না। গাছের নীচে চেয়ার দেব। খাওয়া-দাওয়ার পর ওখানে বসেই না হয় খানিকটা বিশ্রাম নিলেন।'

মানা সরকার নড়েচড়ে বসে। ছোকরা গুছিয়েই খেলতে চায়। কিন্তু উদ্দেশ্যটা কী? এতক্ষণেও ভোটের কথা তো নিজের মুখে কিছু বলল না। থাক, বরং আরও একটু উসকে দেওয়া যাক। তিনি হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলেন। হেসে বললেন, 'তুমি তো জানো কাদু, পার্টি পলিটিক্স যারা করে তাদের খাওয়া-দাওয়ার বদনাম আছে। আমি কিছু খাই না।'

মনে মনে ফের ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল কাদু। পার্টির লোকেরা খায় না! তা হলে খায় কে? শুধু খায় না, সেরকম লোক ছাঁদা বেঁধে বাড়িতেও নিয়ে যায়। মুখে বলল, 'দাদা, বেশি কিছু নয়, একেবারে সামান্য ব্যবস্থা।'

'না, না ছেড়ে দাও।'

এবার আসল অস্ত্র বের করল কাদু। মোক্ষম টোপ। মুচকি হেসে বলল, 'আসলে কী জানেন দাদা, আপনি একটু কিছু মুখে না দিলে শান্তি বেচারি দুঃখ পাবে। অনেক আশা নিয়ে মেয়েটা রান্না করবে।'

কথা শেষ করে দম আটকে স্থির চোখে তাকিয়ে রইল কাদু। মাছ ধরিয়েরা যেমন ভাবে ফাতনার দিকে তাকায়। টোপ কি খাবে? হারামজাদা ইশারা কি ধরতে পারবে? নাকি পারবে না?

পারল। মানা সরকার ভুরু কুঁচকে ঠান্ডা হয়ে বলল, 'শান্তি! শান্তিটা কে কাদু? তোমার বউ নাকি?'

কাদুর চোখ চকচক করে উঠল। কাজ হয়েছে। বিশ্রি দাঁতে এক মুখ হেসে কানে হাত ঠেকিয়ে সে বলল, 'না-না আমায় বিয়ে কে করবে? আমি দাদা একা মানুষ। মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়াই। শান্তি ঝিলডাঙার মেয়ে নয়, বানেরহাটের দিকে বাড়ি। মোহনের কালেকশন। আপনার মতো অতিথি এলে ইস্পেশাল রাঁধবার জন্য ধরে আনে। রাঁধে ফাইন। সমস্যা শুধু একটাই দাদা।'

কাদু থামল। ভুরু তুলল মানা সরকার। মুচকি হেসে বলল, 'আবার সমস্যা কীসের? ঝালের হাত বেশি নাকি?'

কাদু ফের দাঁত বার করল। মানা সরকারের এবার মনে হল, এই লোকের দাঁত এতক্ষণ যতটা কালো মনে হচ্ছিল, আসলে তার থেকেও বেশি কালো।

'ঠিক বলেছেন দাদা, শুধু ঝাল নয়, টক, ঝাল দুটোর হাতই বেশি। তবে মেয়ের দোষ নেই। বয়স অল্প। একটু ছলবলে। ছলবলে মেয়ের টকে ঝালে একটু গোলমাল

তো হয়েই।'

মানা সরকার মনে মনে কাদুর তারিফ করলেন। সরেস খেলুড়ে একেই বলে। শুধু সে-ই কাদুর খবর নেয়নি, কাদুও তার খবর নিয়ে এসেছে। মানা সরকার যে শুধু জিভের স্বাদে খুশি হয় না, অন্য স্বাদও লাগে সে কথা জেনেই ঘরে ঢুকেছে। এ ধরনের ছেলেপিলেই ঠিক মতো গড়ে পিঠে নিতে পারলে একদিন দলের সম্পদ হয়ে ওঠে। তবে দলের সম্পদ বাড়ানোর কাজে তো এখন ব্যস্ত হলে চলবে না। ব্যস্ত হতে হবে নিজের সম্পদ নিয়ে। এই লোকের কাছে চট করে ধরা দেওয়া চলবে না। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেতে হবে। মানা সরকার উঠে পড়ার জন্য তৈরি হলেন। মাদুরের ওপর ছড়ানো কাগজপত্র গোছাতে লাগলেন।

কাদু বলল, 'আর একটা মজার কথা আছে।'

'আবার কী মজা?'

কাদু নিচু গলায় বলল, 'ওই মেয়ে হল গিয়ে দাদা আপনার সাজুনি মেয়ে। শান্তির সাজগোজ দেখলে কে বলবে চষাভুষো ঘরের মানুষ? মোহন তো ঠাট্টা করে বলে, এত ইস্টাইল তুই শিখলি কোথায় শান্তি? হা হা। ও হো মোহন কে সেটাই তো আপনাকে বলা হয়নি দাদা। মোহন আর শোল আমার দুই কর্মচারী। ঝিলডাঙা ব্রাঞ্চ অফিসটা ওরাই দেখাশোনা করে। ছেলে খারাপ নয়। লোকে বলে পেটে বোমা মারলেও কথা বেরোয় না। আমি বলি মোহন, শোলের পেটে কামান দাগলেও...। হা হা। এই যে যাবেন কাক পক্ষীতেও টের পাবে না।'

ইশারা শেষ করে হাসতে হাসতেই সামান্য ঝুঁকে পড়ল কাদু।

মানা সরকার দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। মুচকি হেসে বললেন, 'সেটা ভাল। মানুষের ভিড় সব সময় সহ্য হয় না। ঠিক আছে তোমার ওই লোককে পাঠিও কাদু। তবে বেশিক্ষণ থাকব না কিন্তু। তখন বলতে পারবে না। সন্ধে সন্ধে ফিরিয়ে দিতে হবে। ইলেকশন আসছে এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই বাপু।'

কাদু উঠে দাঁড়িয়ে গদগদ গলায় বলল, 'না-না দাদা আপনাকে আটকাব না। খেয়ে দেয়ে একটু রেস্ট নিয়েই চলে আসবেন।'

'আবার রেস্ট কীসের?'

মানা সরকার আপত্তির ভান করলেন। কাদু মনে মনে বলল, নেকা। রেস্ট কীসের জানো না? শুধু গল্প শুনেই তো চোখ চকচক করছে। এরপর শান্তিকে দেখলে কী হবে?

'আপনি যা ভাল বোঝেন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে সে দেখা যাবে ক্ষণ। এখন চললাম কাদু, মিটিং আছে।'

খুশি মনে কাদু দরজার দিকে পা বাড়াল। প্রথম রাউন্ডে তার জেতা হয়ে গিয়েছে। মানা সরকারের মতো লোককে নিজের ডেরায় নিয়ে গিয়ে ফেলাটাই একটা কঠিন ব্যাপার ছিল। এসব লোকের কাছে মেয়েছেলে পাঠানো যায় না। মেয়েছেলের কাছে এদের নিয়ে গিয়ে ফেলতে হয়। যেতে রাজি হওয়া মানেই তার আদ্দেকটা হয়ে গেল।

'কাদু।'

দরজার সামনে পৌঁছে কাদু ঘুরে দাঁড়াল।

'ডাকলেন দাদা?'

'তোমাদের ঝিলডাঙার চিত্তরঞ্জনটা কে?'

কাদু ভুরু কোঁচকালো। মানা সরকার তার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে সরাসরি। ঠোঁটে অদৃশ্য মিটিমিটি হাসি। এবার খেলায় তিনি দান ছেড়েছেন।

'আরে বাপু তোমাদের স্কুলের মাস্টার। নিজের গাঁয়ের মাস্টারকে চেনো না!'

রাগতে গিয়েও নিজেকে জোর সামলে নিল কাদু।

'বিলক্ষণ চিনি। মাস্টারকে চিনব না? আসলে ঝিলডাঙায় আপনার দাদা তিনটে চিত্তরঞ্জন আছে। একটা গরু ছাগল নিয়ে থাকে। গোবর চিত্ত। আরেকটা দাদা, আপনার মাতাল চাতাল। অম্বল খেয়ে রাস্তার ধারে...। আর এটা হল চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া। পাগলা।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ খুঁটিয়া। মাস্টার আমার কাছে এসেছিল। তুমি নাকিই বলেছিলে?'

কাদুর কাছে এতক্ষণে ঘটনা পরিষ্কার হল। ঠিকই তো, পাগলটাকে তো সে-ই বলেছিল। স্কুলের ফ্যাকড়া নিয়ে ঘ্যান ঘ্যান করছিল, তখন বলেছিল। কাটাবার জন্য বলেছিল। তা বলে সত্যি সত্যি চলে আসবে! হারামজাদার সাহস তো কম নয়! বিরক্তি চেপে বানিয়ে হাসল কাদু।

'ছি ছি, দেখুন দেখি কাণ্ড। নিশ্চয় স্কুলের বাথরুম...আপনার মতো ব্যস্ত মানুষের কাছে ছেলেমেয়েদের হাগা মোতা নিয়ে...।'

মানা সরকার যেন খানিকটা নিজের মনেই বললেন, 'মানুষটা দেখলাম ভাল। বেশ ভাল। ভাবছি, সামনের পঞ্চায়েত ইলেকশনে ঝিলডাঙা থেকে ওকে ক্যান্ডিডেট করব। ভাল লোক ভোটে দাঁড়ালে পার্টির ইমেজ ভাল হয়। তাই না? তুমি একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখো তো কাদু, ঝিলডাঙার মাস্টারের পপুলারিটি কেমন? মনে হয় বেশিই হবে। তার ওপর আমি ওর স্কুলের বাথরুমের ব্যবস্থাটা করে দিলাম। ভেবেচিন্তেই করলাম। তোমাদের ভাষায় ওই হাগা মোতাও অনেকসময় দাম দেয়।'

কথা শেষ করে হাসতে লাগলেন মানা সরকার। জয়ের হাসি।

কাঁচা রাস্তা দিয়ে মোটর বাইক ছুটছে। গোটা শরীরে যেন আগুনের হলকা ছুটছে কাদুর। ঠোঁট কামড়ে নিজেকে কোনওরকমে সামলে রেখেছে সে। সামান্য একটা মাস্টার হবে ঝিলডাঙার নেতা! তারপর আর কাদুকে কেউ মানবে? কেউ ভয় পাবে? শুধু গায়ের জোর নয়, ব্যবসাপাতি পর্যন্ত সব চৌপাট হয়ে যাবে। পেটে লাথি। ঘটনা কি সত্যি? নাকি মানা শুয়োরের বাচ্চা খেলল? হতে পারে। একটা খোঁচা দিয়ে রাখল। নেতারা খোঁচা মারার অনেক কায়দা জানে। তবে যা-ই হোক ওই পাগলা মাস্টারকে এখনই ঠেকাতে হবে। মাথা ঠান্ডা করে নতুন গজিয়ে ওঠা উপদ্রব সামলাতে হবে। আগে মানা সরকার, তারপর চিত্তরঞ্জন খুঁটিয়া।

কাদুর মোটরবাইক গর্তে পড়ে লাফিয়ে উঠল।

• পরের এপিসোড আগামী রোববার

ছবি শান্তনু দে.

পুজোর মেজাজের শুরু। আর প্রত্যেক বছরের মতো গান-বাজনা আর আমোদ উল্লাসের মাধ্যমে! এই বছরের সঙ্গীত সন্ধ্যায় থাকছেন হৈমন্তী শুক্লা, নচিকেতা, শুভমিতা, রূপঙ্কর, রাঘব, অনসূয়া, সহজ মা, সুপ্রতীক, মৌ মুখার্জি, জয়তী চক্রবর্তী, জোজো ও আরও অনেকে। তাহলে, শুরু হোক পুজোর হৈ-হুল্লোড়!

প্রতিদিন | saregama Soul of India

আয়োজিত

RiCE EDUCATION ও Adamas Knowledge City

# আগমনী

BIG 92.7 FM | TMS

সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়াম

সেপ্টেম্বর ২৯, মহালয়া
সোমবার বিকেল ৫টা থেকে

## মা দুর্গা তো রেডি। আপনি?

এসে গেলো আগমনী।




সংবাদ প্রতিদিন হেড অফিস • মাস্টার কিচেন (স্টার থিয়েটার, হাতিবাগান) • শ্যামবাজার হোসিয়ারী হাউস (শ্যামবাজার পাঁচমাথা) • দেজ পাবলিশিং (কলেজ স্ট্রীট) • গেমস্ এন্ড স্পোর্টস (চৌহাটি, সোনারপুর) • কথামালা (রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, মানিকতলা) • মিউজিক ওয়ার্ল্ড (পার্ক স্ট্রীট) • শিবা হুইলস (গাঙ্গুলীবাগান) • কমিউন ইলেকট্রনিক্স (বেহালা ম্যান্টন সুপার মার্কেট) • লোকনাথ পান সপ (যাদবপুর ৮বি বাস স্ট্যান্ড) • সাম্যুর (ভবানীপুর) জি-৫৫ (দক্ষিণাপন) • আনন্দমেলা (গড়িয়াহাট)

## হাত বাড়ালেই রাইমা। খুচখাচ ঝামেলা, টুকটাক সমাধান। একটু বন্ধুত্ব আর অনেকটা বিশ্বাস। চিন্তা কীসের, আপনার কাছে রাইমা আছে

**আমার বয়স তেইশ। ওজন সাতায় কেজি। আগে নিয়মিত জিমে যেতাম। কিন্তু এখন সময়ের অভাবে আর যাওয়া হয়ে ওঠে না। ফলে আমার শরীরে মেদ জমেছে। এবং ভুঁড়িও হয়েছে। আগে আমার কোমর ছিল ২৮ ইঞ্চি কিন্তু এখন সেটা দাঁড়িয়েছে ৩১ ইঞ্চিতে। পুজোর আর ক'দিন মাত্র বাকি। খুব ইচ্ছে ছিল পুজোয় স্কিন টাইট শার্ট পরার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সে শখ মাটি। তুমি আমায় প্লিজ বলে দাও, কী করলে এই ক'দিনের মধ্যে আমার মেদ কমবে।**

—সুখেন বিশ্বাস, কলকাতা

[illegible] ম্যাজিক জানি যে, এই ক'দিনের মধ্যে [illegible] মেথড বলে দেব? এটা একটা টাইম [illegible] মতে, তুমি আবার জিমে যাওয়া [illegible] ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ, প্রাণায়াম—এসব করো। এগুলো রেগুলারলি করলে উপকার পাবে। আইসক্রিম, চকোলেট, কোল্ড ড্রিংক, অয়েলি খাবার—স্পেশ্যালি ভাজাভুজি, ফাস্ট ফুড খাওয়া একেবারে বন্ধ করে দাও। বাদবাকি যা করবে, সেটা জিমে গেলেই ইনস্ট্রাকটর বলে দেবেন।

**আমার বয়স পঁচিশ। আমার এম.এ কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। আমি চাই আরও পড়াশোনা করতে। ইচ্ছে আছে পিএইচডি করার। কিন্তু বাবা চাইছেন, আমি ওঁর বিজনেস জয়েন করি। বলছেন, এত পড়াশোনা করে কী হবে! আসলে আমি একমাত্র ছেলে, তাই বাবা চাইছেন, বেঁচে থাকতে থাকতে আমাকে ব্যবসার দায়দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যেতে। তার সঙ্গে এটাও চান, আমি যাতে তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলি। কিন্তু এগুলোর কোনওটাই যে আমি এত তাড়াতাড়ি চাই না, তা কী করে বাবাকে বোঝাব?**

—আবির সাহা, সোনারপুর

আমি তোমার প্রবলেমটা বুঝতে পারছি। আসলে এটা অনেক সময় হয় যে, বাবা মায়েরা সন্তানদের ভাল চাইতে গিয়ে, নিজেদের ইচ্ছেগুলো তাঁদের ছেলেমেয়েদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেন। ছেলেমেয়েদের ইচ্ছে-অনিচ্ছে নিয়ে তাঁরা বিশেষ মাথা ঘামাতে চান না। যদিও সব বাবা মা'রাই এমন—আমি তা বলছি না। তোমার ব্যাপারটা খুব সেনসিটিভ। বাবাকে সবকিছু তুমি ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে বোঝাও। বাবাকে বলো, বিজনেস তুমি নিশ্চয়ই জয়েন করবে, তবে পড়াশোনাটা কমপ্লিট করে। এটাও বলো, পড়াশোনার ফাঁকে তুমি বাবাকে ব্যবসার কাজে সাহায্য করবে। আমার মনে হয়, ভালভাবে বোঝালে বাবা ঠিক বুঝবেন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই ঠিকানায় লিখো—সেন সলিউশনস, রোববার, সংবাদ প্রতিদিন ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭২

# তারে জমিন পর

প্রন থার্মিডর মুখে তুলতে তুলতে দেখলেন, পাশে হাসছেন মেরিলিন। চিকেন স্যান্ডউইচ-এ কামড় বসাতেই নজর দিচ্ছেন অ্যাঞ্জেলিনা জোলি। তারিয়ে তারিয়ে ডেসার্ট খাওয়ার সময় হয়তো রাগী চোখে তাকিয়ে ক্লিন্ট ইস্টউড। ডিনারে হরবখত এমনই তারাবাজি হোল সিজন।
বিদিশা চট্টোপাধ্যায়

**বান্ধবীকে নিয়ে খেতে গিয়েছেন অথচ চোখ চলে যাচ্ছে মেরিলিন মনরো'র দিকে।** কিংবা কোনাকুনি দাঁড়িয়ে থাকা টুম্ব রেডার জোলির দিকে। গার্লফ্রেন্ড তো রেগে ফায়ার। ওম শান্তি ওম। আরে বাঁ পাশে দীপিকা পাড়ুকোনে যে! হাসছে মিটিমিটি আপনারই দিকে তাকিয়ে। স্মাইল ব্যাক না করে উপায় আছে! ওয়েল 'সাম লাইক ইট হট'। লাইনে আছেন আরও অনেকেই। হট অ্যান্ড হ্যান্ডসাম ক্লিন্ট ইস্টউড, জন ওয়েন, হলিউডের স্পাইডারম্যান আর বলিউডের কিং খান। পুরো তারকা সমারোহ। আপনি স্টারস্ট্রাক হতে বাধ্য। রেস্তোরাঁয় বসে প্রেম আর ডিনারে আপনি একেবারে 'গন উইথ দ্য উইন্ড'। যাকে বলে হৃদি ভেসে যায়...।

এলগিন রোডের ফোরামের ফোর্থ ফ্লোর এমনই এক নির্ভেজাল ফুর্তির ঠিকানা। সিনেমা টিনেমা, খাওয়া-দাওয়া একইসঙ্গে। টিকিট কেটে আইনক্সে না ঢুকে স্টারস্ট্রাক-এ খেতে গেলে টেবিলেই সার্ভ হবে মুভি ম্যাজিক। এই মাল্টিকুইজিন রেস্তোরাঁ যাকে বলে 'পূরব অউর পশ্চিম'-এর পারফেক্ট 'সঙ্গম'। মেক্সিকান, চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল, ইন্ডিয়ান সব রকমের আয়োজন আছে এই খানাপিনার 'জন্নত'-এ। কোনও 'দিওয়ার' নেই। অবারিত দ্বার। 'দিওয়ানা' না হয়ে উপায় আছে।

স্টারস্ট্রাক-এর কর্ণধার বান্টি শেঠির মুখে জানা গেল কেন এই তারকা সমারোহ, রেস্তোরাঁর দেওয়ালে ছবির পোস্টার, সিনেমার কাটিং, নায়িকার কাট আউট ছবি। বান্টি নিজে সিনেমার পোকা। হলিউডি ক্রাশ তাঁর রক্তে।

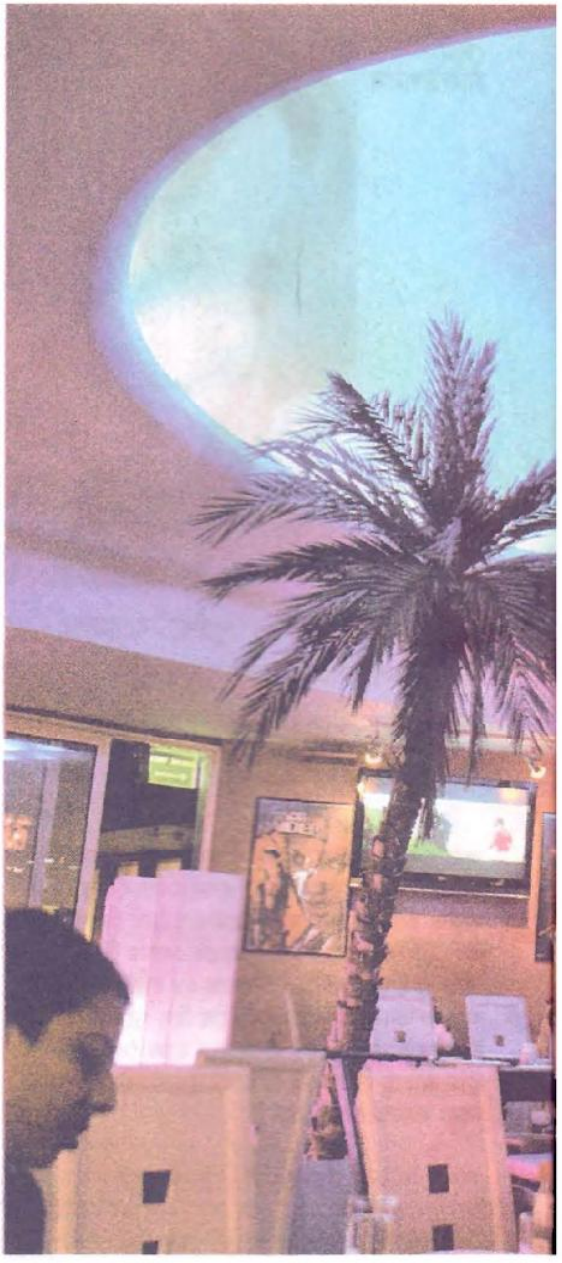

তাই তাঁর রেস্তোরাঁকে বানাতে চেয়েছিলেন প্ল্যানেট হলিউড। এই রেস্তোরাঁ তাই পুরো ফিল্মি। খেজুর গাছের তলায় লাঞ্চ সারতে সারতে স্বচক্ষে দেখতে পাবেন 'স্টার ওয়ারস'। মেনু লিস্ট পুরোটাই ইয়াম্মি। কোনও 'ইনডিসেন্ট প্রোপোজাল' নেই তাই 'বেবিজ ডে আউট'-এ গিয়ে অর্ডার দিন আপনার ইচ্ছেমতো। মেক্সিকান মেনুতে রয়েছে স্যান্ডউইচ, সুপ অফ মুভিস, ফরেস্ট চাঙ্ক-এর ফ্যাবুলাস স্যালাড, পাস্তা, প্রেটি পিৎজা, মাই ফেয়ার রিসোটো-র রোলিং স্টোন। স্টারস্ট্রাক হল পশ্চিমি রান্নার 'দ্য হ্যাপেনিং' প্লেস। এখানে পাবেন প্রন থার্মিডর, চিকেন স্টেক, ল্যাম্ব চপস কিংবা গ্রিলড প্রন-এর 'অটাম সোনাটা'। শুধু কি তাই! থাই এবং চিনা খাবারের স্বাদ যেন জ্যাকি চ্যান আর মল্লিকা শেরাওয়াতের ম্যাজিক

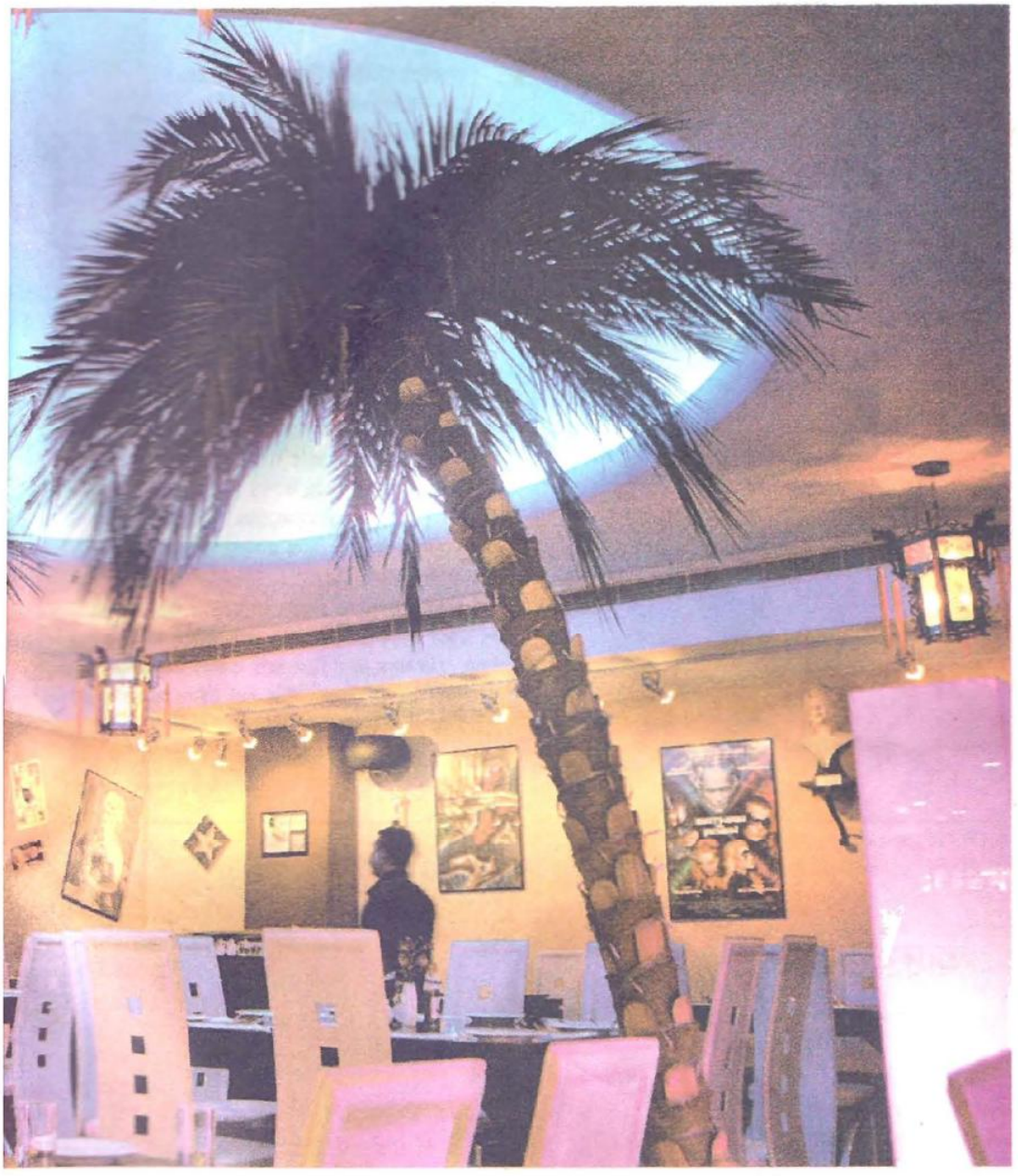

[illegible] স্টিকের ফাঁদে নুডলস-এর 'স্ট্রিপটিজ' [illegible] রিমেম্বার'। চিকেন ইন হট [illegible] স্টাইল রাইস নুডলস, ড্রামস অফ [illegible] টম ইয়াম সুপ, করিয়েন্ডার [illegible] ক্রিস্পি মাশরুম, জাম্বো প্রন মুখে [illegible] হতে পারে [illegible] 'অ্যায়সি'।

এই [illegible] খেতে খেতে টুটতা [illegible] বসে পড়তে পারে [illegible] প্রেমিকার হাত [illegible] করুন। যেন [illegible] ওর সঙ্গেই [illegible] করতে পারেন এই টুইঙ্কল-টুইঙ্কল রেস্তোরাঁয়। নতুন [illegible], নতুন সিনেমা, [illegible] নতুন জোয়ার [illegible] পুরনো বান্ধবী কিংবা সেই এক [illegible] [illegible] 'জব উই মেট' থেকে [illegible]

চলে! ফ্লেভারটাই তো পাবেন না!

বিদেশ ঘুরে দেশের মাটির সোঁদা গন্ধেও সেই এক মনকেমন এই রেস্তোরাঁর প্রতিটা মেনুতে। কভি কাবাব কভি তন্দুরি, রোটি বাটার অউর বাসমতী, কী নেই! জিভে জল আনবে সরসোওয়ালি মছলি, মাটন রসুলি কাবাব, স্পাইসি মুর্গ টিক্কা। 'মাদার ইন্ডিয়া'-ও যে কম যায় না। পুজোর চারদিন রয়েছে স্পেশাল বুফে অফার। কিন্তু শেফ দিলীপ দে জোর দিলেন কন্টিনেন্টাল-এর উপরেই। এবং বারবার বললেন ফিশ অ্যান্ড চিপস্-এর কথা। চটপটি আর স্বাদু এই রেসিপিও দিয়ে দিলেন রোববারের পাঠকদের জন্য। যদি কখনও 'হোম অ্যালোন' থাকেন তা হলে সময় নষ্ট না করে ঝটপট বানিয়ে ফেলুন ফিশ অ্যান্ড চিপস্।

ফিশ অ্যান্ড চিপস্ বানাতে লাগবে

কলকাতা ভেটকির ফিলে—১৭৫ গ্রাম
ব্রেড ক্রাম্বস—১০০ গ্রাম
ময়দা—১০০ গ্রাম
লেবুর রস—১ টা
কুচানো পার্সলে—১ চা চামচ
ফ্রেঞ্চ মাস্টার্ড সস—১ চা চামচ
সাদা মরিচ গুঁড়ো—১/৪ চা চামচ
সাদা তেল—৪ চা চামচ
ডিম—১ টা
নুন—স্বাদমতো

**এবার**

প্রথমে ফিলে কেটে দু'টো বড় ভাগ করে নিন। এরপর নুন, লেবুর রস আর অল্প জলে ধুয়ে নিন।

এবার শুকনো পাতলা কাপড় দিয়ে ভাল করে সোক করে নিন। একটা পাত্রে ময়দা, ডিম, দু-চা চামচ লেবুর রস, কুচোনো পার্সলে, ফ্রেঞ্চ মাস্টার্ড সস, নুন এবং মরিচ ভাল করে ফেটিয়ে নিন।

এরপর এই মিশ্রণ মাছের গায়ে ভাল করে লাগিয়ে দশ মিনিট রেখে দিন। তারপর ব্রেড ক্রাম্বস মাখিয়ে, পাত্রে তেল গরম করে ডিপ ফ্রাই করুন। মধ্য আঁচে ভাজবেন। এরপর ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস এবং টার্টার সসের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

ছবি তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

*Approach Roads & Bridges*

*Multi-product SEZ's*

*Several Small & Medium Scale Enterprises*

*Health, Education & Residential Developments*

*Over 17 lakh job opportunities*

## Coming Soon

NKID
NEW KOLKATA INTERNATIONAL DEVELOPMENT
*A City of New Opportunities*

*A City of New Opportunities*

*For the growth and transformation of the economic and social landscape of West Bengal.*

unitech | Universal Success

Chowringhee Court, 4th Floor, 55 & 55/1, Chowringhee Road, Kolkata - 700 071
033-40026160

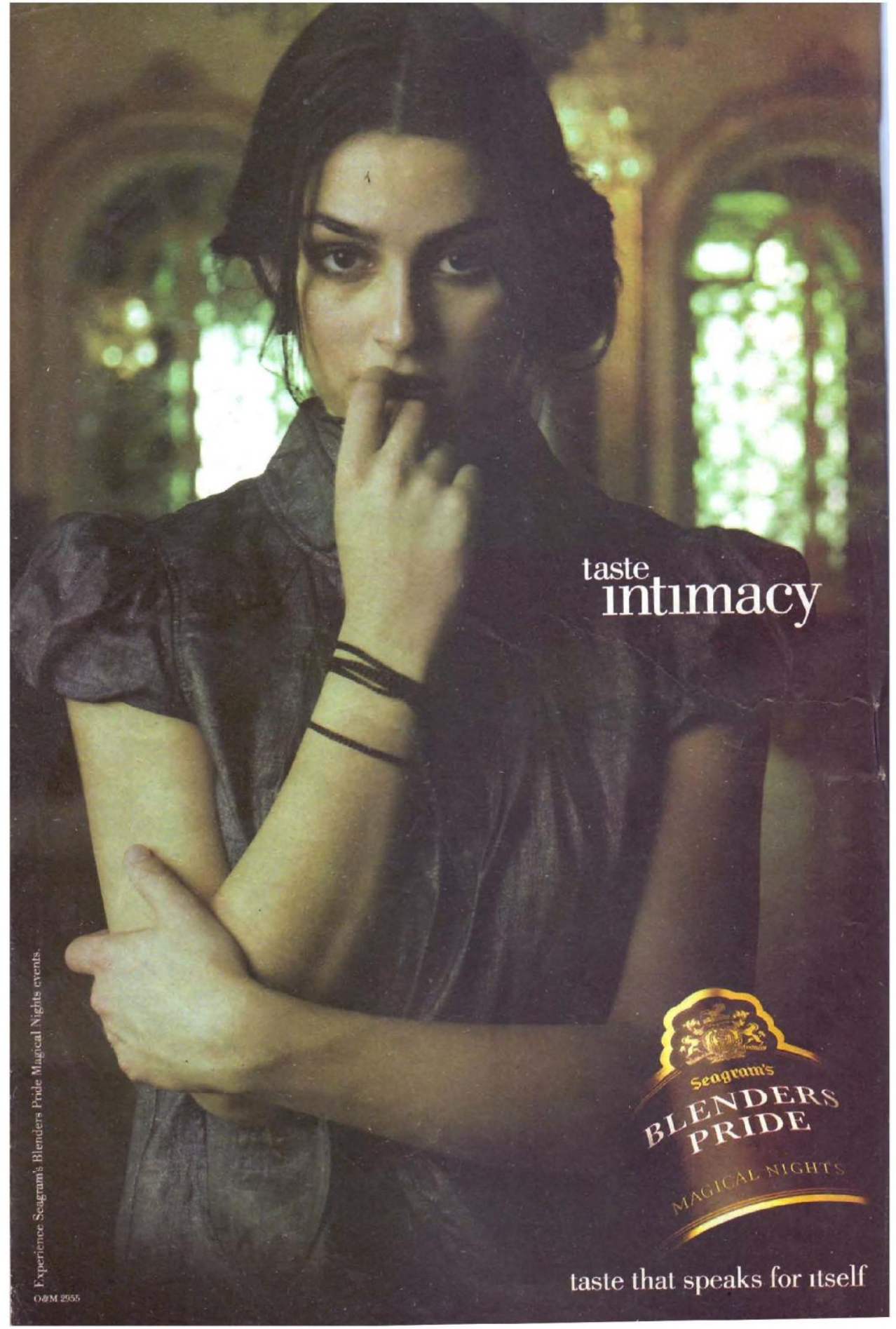
taste
intimacy
Seagram's
BLENDERS
PRIDE
MAGICAL NIGHTS
taste that speaks for itself
Experience Seagram's Blenders Pride Magical Nights events.
O&M 2955